Interview details

Interview with Khaled Hussain

Interviewed by Farhan Apurbo

ফারহান: বাড়ির কারো কাছ থেকে হয়ত ভারত দেশভাগ এটা নিয়ে অনেক গল্পই শুনেছেন। সেরকম গল্প যদি আমাদের কাছে শেয়ার করতেন। আমি কোন বাধা দিচ্ছি না আপনি জাস্ট বলতে থাকুন।

খালেদ: হ্যাঁ সাতচল্লিশের গল্পটা আমি শুনেছি বাবার কাছ থেকে। যেটা শুনেছি এবং বইয়ে পড়েছি। পৃথিবীর বড় একটা মাইগ্রেশন হয়েছিল সাতচল্লিশে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এক বর্ডার থেকে আরেক বর্ডারে গিয়েছিল। সে চক্রে আমার পরিবারও ছিল। আমার বাবা ছিলেন মূলত। এবং আমার চাচা ছিলেন দুইজন। বাবার কাছ থেকে যেটা শোনা হয়েছে যে আমাদের বাড়ি ছিল পাটনাতে। জ্যোতিনগরে। গ্রামের নাম ছিল হিলসা গ্রাম। ওখানে আমাদের খুব বড় ব্যবসা ছিল। দাদার ব্যবসা ছিল। সেই ব্যবসা ছিলো... উনি যেটা বুঝিয়েছেন যে ফরচুনের ব্যবসা। আমি সেটা বুঝতে পারিনি। তারপর তিনি বুঝিয়েছেন যে আমরা যেটা গ্রোসারি শপ বলি ওটাই ছিল। কলকাতাতে ছিল এবং পাটনাতে ছিল। তো দাদা... বাবা যেটা বলেছেন যে দাদা অনেক তাড়ি খেত। একটা ইয়ে.. হল খেজুরের রস দিয়ে যেটা বানানো হয়। ওই তাড়ি খাওয়ার ফলে তার লিভার নষ্ট হয়ে গেছিলো। ওই পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশে। ওই সময় উনি মারা যান। তারপর আমার বাবার.. মামারা যারা ছিলেন তারা ব্যবসাটাকে ওন করলেন এবং রান করতে থাকলেন। তার মধ্যেই সাতচল্লিশ চলে আসল। আগে তো ফর্টি সিক্স হল। ফর্টি সিক্সে যেটা হয়েছে... আপনারা হয়তোবা জানেন। ওই বিহারে বড় একটা রায়ট হয়েছিল। ছেচল্লিশে। সম্ভবত ওটা অক্টোবর মাসে। ওই রায়টে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বিহারিকে হত্যা করা হয়েছিল। এবং ওই হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই আমাদের পরিবার ছিল। সে সময় যেটা হলো - ওই পুরো গ্রাম থেকে গ্রাম লোককে মারা হচ্ছে, কাটা হচ্ছে। তো আমার বাবা দুই ভাই ছিলেন। আর ছোট বোন ছিল বাবার। একদম ছোট। তখন তার বয়স মাত্র এক বছর। আর আমার দাদি ছিলেন। দাদা আগেই মারা গিয়েছেন। তো বাবা যেটা

বললেন, যে যেভাবে মুসলমানদের ওপর যে আক্রমণ করা হচ্ছে হিন্দুদের দ্বারা এবং মূলত যেটা ছিল যে মহিলাদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। তাদেরকে রেপ করা হচ্ছে - ধর্ষণ করা হচ্ছে। তো আমার দাদি, আমার আব্বার ফুপু এবং আব্বার বোন, ছোট বোন যে ছিল, তারা দেখল যে তাদের বাঁচার আর কোন সুযোগ নেই। তারা নিজেদের (জন্য) যদি কিছু না করে তাহলে কিন্তু আবার হিন্দুদের আক্রমণের শিকার হতে হবে। তো আমাদের বাসায়... আমার বাবা বললেন যে, একটা বড় কুয়া ছিল। তো মহিলারা সবাই ওই কুয়াতে ঝাঁপ দিয়ে দিলেন। দেওয়ার আগেই, আগমুহূর্তে, বাবা যেটা বললেন, বাবার বয়স তখন ছিল দশ বছর, আর বাবার ছোট যে ছিল, আমার চাচা যিনি, উনার বয়স তখন প্রায় সাত বছরের মতো। তিন বছরের ছোট-বড় ছিলেন উনারা। তো জাস্ট ওই কুয়াতে লাফ ঠিক আগে দাদি বলল বাবাকে যে, দেখ তোমরা, তোমরা দুইভাই এখান থেকে পালায় যাও। যেখানে দেখবা লোকজন যাচ্ছে তোমরা ওদিক দিয়ে চলে যাবা। আমরা আর এখানে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না। এই বলে তারা সবাই, মহিলারা যারা ছিলেন তারা কুয়াতে লাফ দিলেন। লাফ দেওয়ার পর উনারা... শেষ হয়ে গেল। বাবা দেখল যে, এ কি হচ্ছে! আমার সামনে আমার মা..... তখন ছোট, উনি বলতেছেন, উনি খুব কান্নাকাটি করছেন.... আর কিছু করার নেই। কোন লোকজন নাই। আর বাবার যে মামারা ছিল, তারাও কিন্তু আর ওইভাবে সাপোর্ট দিতে পারল না। তারাও, সবাই পালাচ্ছে, একদিকে চলে যাচ্ছে। সেসময় আমাদের বাসায় যে হিন্দু ভদ্রলোক কাজ করতেন, উনি ওই গ্রামেরই ছিলেন। তো উনি দুইজনকে, বাবাকে আর চাচাকে সাথে করে নিয়ে গেল। তার পাশের বাসায় নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পর বাবা বললেন যে, প্রায় ছয় থেকে সাত দিন তাদেরকে, চালের বস্তা থাকে, ওই বস্তার পিছনে তাদের লুকায় রাখলো। রাখার পর উনি বললেন, এক পর্যায়ে যে, মনে হয় আমি তোমাদেরকে আর এখানে রাখতে পারব না। তো বেটার হয় তোমরা, আমি তোমাদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবো, নিয়ে গিয়ে তোমাদের ওখানে দিয়ে দিবো, তোমাদের লোকজন যারা মুসলমান তারা এদিক থেকে পালাচ্ছে। ওই পাকিস্তান একটা নতুন দেশ হয়েছে ওই পাকিস্তানের দিকে যাচ্ছে। তো বাবাকে আর চাচাকে ধুতি পরিয়ে দিল। ধুতি পরিয়ে এনে কলকাতা স্টেশনে ছেড়ে দিল। বলল, দেখ ওই ট্রেন গুলো যাচ্ছে, পাকিস্তানে যাচ্ছে, তোমরা

ওদিকে চলে যাবা। গিয়ে তোমরা দেখবা ওখানে তোমাদের আত্মীয় স্বজন পাবা এবং অনেক মুসলমান লোকজন আছে তাদেরকে পাবা। তো ওই স্টেশনেই আবার বাবা চাচাকে হারায় ফেলে। দুই ভাই, দুজনেই ছোট। উনি আর উনাকে ধরতে পারল না। উনাকে হারায় ফেলল, তো উনি একটা ট্রেনে উঠে গেল, ছোট ভাই আরেকটা ট্রেনে উঠে গেল। উঠার পর তারা ওখান থেকে চলে আসল এদিকে। পশ্চিম...ইয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসল। তখন এটা পূর্ব পাকিস্তান। যা আজকে বাংলাদেশ। এখানে আসার পর উনারা উঠল নওগাঁতে। সান্তাহার-নওগাঁ এই জায়গাগুলোতে উনারা চলে আসল। আসার পরে আমার বাবা... ইয়ে শিবিরগুলোতে, উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে তার ছোটভাইকে খুঁজতেছে। কোথায় আছে-কোথায় আছে? পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে যখন ওই ভাইকে খুঁজতেছে তারই মধ্যে তিনি পেয়ে গেলেন তার মামাকে। যে মামারা ওখানে তার বিজনেসগুলো ওন করছিল। মামা আবার উনাদের দুজনকে খুঁজতেছে। আমার দুজন ভাগ্নে কোথায়। একজনকে পেয়েছে। তো খুঁজতে খুঁজতে মামা আর ভাগ্নে মিলে তার ছোট ভাইকেও পেয়ে যায়। পাওয়ার পরে উনারা আবার ওখান থেকে চলে আসে। সান্তাহারে চলে আসে। সান্তাহারে এসে উনারা আবার লাইফ শুরু করে। খুব কষ্ট হল যেহেতু বাবা বলল, খুব ভালো পরিবারে ছিলেন, জীবনে কখনও কষ্ট দেখেন নাই, কিছু নাই। তারপর সেই বয়সে বাবা মারা যায়, দেশভাগ হয়ে যায়। আর এডুকেশন তার জীবনে আসে না। শিক্ষার কোন সুযোগ হয় না। মামারাও ওখান থেকে চলে আসছে। কোন সহায় সম্পত্তি নাই। উনি স্ট্রাগল করতে লাগল। ডে লেবর হিসেবে কাজ করছে। তার পরিবার আছে। সে তার বাচ্চাকে পড়াবে না তার ভাগ্নেকে পড়াবে সেই বলে উনি তার ভাগ্নেকেও কাজে লাগায় দিলো। রেলওয়েতে, রেললাইনে উনি শুরু করল, কাজ শুরু করল। করতে করতে একপর্যায়ে বাবা চলে আসল। ঢাকাতে চলে আসল। ঢাকাতে চলে আসার পর ছোটভাইকে পড়ানোর চেষ্টা করল। সেই ক্লাস এইট পর্যন্ত উনি নিয়েই গেল টেনেটুনে তারপর বাবা চাকরি করতে করতে... লেবারের কাজ করতে করতে এখানেই থেকে গেলেন। এই এই অঞ্চলেই থেকে গেলেন। একপর্যায়ে উনার বিয়ে হল। বিয়ে হবার পর সংসারগুলো গুছাচ্ছিলেন। যে একটা পর্যায়ে লাইফটা সেট হচ্ছিল। বিয়ে হয়েছে, মেয়ে হয়েছে, ছেলে হয়েছে, খুব সুন্দরভাবে জীবন চলছে। যেটা বাবা বলল যে তখন পাকিস্তান পিরিয়ডে

আমাদের বাসা ছিল... আলুবাজারে ছিল। বাবা বলতেন যে, জাস্ট আমাদের বাসা ছিল মতিয়া চৌধুরীর বাসার পাশে। আমার মা যখন জীবিত ছিলেন তখন খবরে যখন মতিয়া আপাকে দেখতেন তখন বলতেন, এই মতিয়া আপার বাসার পাশেই আমাদের বাসা ছিল। আলুবাজারে। এবং খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। মতিয়া চৌধুরী..... আমাদের বাড়ি ছিল, মতিয়া চৌধুরীর বাড়ি ছিল। খুব সহজেই, উনি কাউকে চিনতেন, না চিনতেন কিন্তু মতিয়া চৌধুরীকে চিনতেন। যখন ওই এলাকায় তিনি ছিলেন। তো একটা পর্যায়ে তাদের আবার লাইফে আরেকটা ঘটনা ঘটে গেল, যে সেভেন্টি ওয়ান নিয়ে এখানে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। তখন আবার উনাদেরকে সেভ করতে হলো। যে এখন কি করবো। তখন তো আবার উনাদের চারজন, দুইজন মেয়ে দুইজন ছেলে আছে। একটা পর্যায়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে। তখন আমার বাবা কাজ করতেন জেনি কাবাব নামে একটা ইয়ে ছিল ঢাকাতে, ওল্ড ঢাকাতে ছিল। মালিক ছিল পাঞ্জাবী একজন । তো যখন উনি দেখল যে দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা পাকিস্তান আর থাকবে না। বাংলাদেশ সৃষ্টি হবে। বা বাংলাদেশ নামে একটি দেশ হবে। তো ওই ভদ্রলোক যেহেতু পাকিস্তানি ছিলেন, শিক্ষিত ছিলেন, তিনি ফোরকাস্ট করতে পেরেছিলেন যে আসলে কি হতে যাচ্ছে। তো উনি আমার বাবাকে খুব স্নেহ করতেন যে, না; উনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন, খুব হার্ডওয়ার্কার ছিলেন। তো উনি বললেন, দেখ আমার মনে হয় না এখানে আর ব্যবসা করবো। যেহেতু দেশের পরিস্থিতি খারাপ, দেশটা ভাগ হয়ে যাবে, তুমি আমার সঙ্গে চল, পাকিস্তানে আমরা যাই। আমার বাবা বললেন যে আমি পাকিস্তানে যাবো না কারণ আমার ওয়াইফের যে পরিবারগুলো আছে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আছে। নওগাঁতে আছে, সান্তাহারে আছে, রংপুরে আছে। তো সামহাউ ওদেরকে তো দেখতেই হয়। তো আমি কোথায় যাবো? পাকিস্তানে কেউ নাই আমার, আমি কাউকে চিনি না ওখানে। এখানে তো এতদিন থেকে, এখানে দশ বছর বয়সে আসছি আর এখন আমার বয়স তিরিশ চল্লিশ হয়েছে আমি ওদিকে আর যেতে পারব না। এখানেই আমি থাকব। এই আলো বাতাসেই থাকব। এই বলে উনি আর যান নাই। না যাওয়ার কারণে এখানে যেই দিনগুলি চলে আসছে, যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে তার মধ্যে একটা পর্যায়ে আমার বাবা এদিক থেকে সেদিকে পালাচ্ছে।

পালানোর পরে কোনভাবে লুকায় ছিল। যেহেতু উর্দুভাষী লোকদের উপর খুব বড় একটা বিপদ ছিল তখন। ২৬ মার্চের পরে কিন্তু একটা রিভেঞ্জ চলে আসছে যে যারাই উর্দুভাষী তাদেরকেই মনে করা হচ্ছে পাকিস্তানি আর্মির অ্যালায়েন্স। কেননা যে উর্দু ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং আমাদের কম্যুনিটির উর্দুভাষী যারা ছিল তারা কিন্তু উর্দু কথা বলত। ইভেন এই উর্দু, এরা তো উর্দুভাষী মূলত কিন্তু পাঞ্জাবী আর্মি যারা তার কিন্তু উর্দুভাষী না, যারা বেলুচি আর্মি তারা কিন্তু উর্দুভাষী না। তাদের কিন্তু অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। কিন্তু আমাদের কম্যুনিটি যে সাফার করল শুধুমাত্র তার ভাষার কারণে। যেহেতু তার উর্দু বলে। এখন যে আর্মিরা উর্দু বলছে, আর্মিরা রেপ করছে বাঙালি মহিলাদেরকে, বাঙালি মেয়েদেরকে বা আর্মি হত্যা করছে বাঙালিদেরকে, উর্দু কথা বলছে তারা। তো একপর্যায়ে সাধারণ গ্রামের মানুষরাও কিন্তু, তারা চিন্তা করতে লাগল যে এরা তো সেম কথা বলে অথচ উর্দুভাষী যারা সিভিলিয়ান ছিল, যারা দিন আনে দিন খায়, যারা ভালোমানুষ ছিল, তারা কিন্তু অস্ত্র ধরে নাই। কিন্তু রিভেঞ্জগুলো চলে আসছে তাদের ওপরে। যে তোমরা তো ওই জাতিরই লোক। অথচ এই উর্দুভাষী যারা ছিল তারা ইন্ডিয়া থেকে আসছে, বিহার থেকে আসছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছে বা বাঙ্গাল থেকে আসছে, তার কিন্তু ভিন্ন জাতি, পাঞ্জাবী একটি ভিন্ন জাতি, বেলুচি একটি ভিন্ন জাতি, সিন্ধি একটি ভিন্ন জাতি। কিন্তু এখানকার এই অঞ্চলের সাধারণ বাঙালিদের একটা ধারণা ছিল যে এরা একটা, তাদের অংশ বা এরা সেম জাতি। তো এরা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে আমরাও এদের ওপর অত্যাচার করব। তখন আপনি দেখবেন যে পুরো বাংলাদেশে যেখানে যেখানে রেলওয়ে ছিল সেখানেই কিন্তু উর্দুভাষীদের একটা লোকালিটি ছিল। এরা বেস করেছিল কিন্তু রেলওয়ে থেকেই। এরা যখন মাইগ্রেট করেছে নাইনন্টিন ফোরটি সেভেনে বা সিক্সটি ফাইভে, যারা রেলওয়ে ওয়ার্কার ছিলেন তাই কিন্তু চলে আসলেন এদিকে। আর যেখানে রেল ছিল সেখানেই এরা ছিল। আর খুব বড় একটা কম্যুনিটি গড়ে উঠেছিল, খুব ভালো অবস্থা ছিলো, খুব প্রিভিলেজড ছিলো কিন্তু যখন দেশটা ভাগ হতে শুরু করল তখন রিভেঞ্জের কারণে লোকেরা আবার তাদের ওপর অত্যাচার করে, হত্যা করে বা তাদের যে প্রপার্টিগুলো ছিল তা লুটে নেয় বা দখল করে। যার কারণে উর্দুভাষীরা নিজেদের গুটিয়ে ফেলেছিল। আমার

পরিবারও সেই কাজটিই করেছিল। তারা চেষ্টা করেছিল যে যেখানেই উর্দুভাষী আছে তারা সেখানে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে, নিজেদেরকে লুকাবে। কিন্তু একটা পর্যায়ে আমার বাবা, তখন আমার দুই ভাই দুই বোন, আমার জন্ম হয় নি তখন, ঐ আলুবাজার থেকে বেরিয়ে এদিকে মিরপুর-মোহাম্মদপুরের দিকে আসার চেষ্টা করলো। যেহেতু এদিকে একটা বড় কম্যুনিটি আছে। নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ানের সিক্সটিন ডিসেম্বর যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, নতুন একটা দেশ হয়েছে তখন তারা এদিকে আসার চেষ্টা করলো। ওই আসার পরেই আমার বাবাকে মুক্তিবাহিনী এবং যারা এখানকার সৈন্য ছিল তারা অ্যারেস্ট করলো। ওই সময় কিন্তু গণ অ্যারেস্ট হচ্ছিল, গণ গ্রেফতার হচ্ছিল। যাদেরকে, পুরুষদেরকে ধরছে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো সেই ইয়েতেই আমারে বাবাকে নিয়ে গেল। আমার বাবাকে, মায়ের সামনে, জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার সময় আমার মা বলল, তোমরা আমাকে জাস্ট জানাও আমার স্বামীকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? কিভাবে আমার স্বামীকে ফিরে পাবো বা কোথায় তোমরা নিয়ে যাচ্ছো? তারা বলল, না আমরা নিয়ে যাচ্ছি, জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেব। তো ইতিমধ্যে আমাদের যে এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে, মিরপুরের দিকে ওরা গিয়েছিলেন পালিয়ে। মিরপুরে যে কাহিনিটা হয়েছিল, ওরা বলেছিল যে, চল তোমাদেরকে পিস মিটিংয়ে নিয়ে যাবো। গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে গিয়ে আর এদিকে নিয়ে আসছে না। গাবতলীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে গাড়িগুলো গাবতলীর দিকে যাচ্ছে, আমার মা যেটা বলেছিলেন, যে গাড়িগুলো গাবতলীর দিকে যাচ্ছে সেগুলো আর ফিরে আসছে না। ওখানেই তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে। তা মায়ের ওই ভয়টাই কাজ করছিল যে, যেহেতু উনাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে উনাকে মনে হয় আমরা আর ফিরে পাব না। তো আমার মা খুব কাকুতি করত ওই সোলজারদেরকে, মুক্তিবাহিনীকে, যে দেখো আমার স্বামী তো কারো কোন ক্ষতি করে নাই, উনি দিন এনে দিন খাওয়া লোক। আমরা খুব কষ্ট করে এখানে চলি, আমাদের বাচ্চা আছে, আমরা তো কারও কোন ক্ষতি করি নাই। আমরা ভালো একটা জায়গায় ছিলাম। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে কোন কষ্ট দেইনি বা ওদের কাছ থেকেও আমরা কোন কষ্ট পাই নি। তো আমাদের কি দোষ, তোমরা আমার স্বামীকে কেন নিয়ে যাচ্ছো? ওরা বলল যে, না আমরা

নিয়ে যাচ্ছি, আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেব। বলে তাকে নিয়ে গেল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তারা বলল, আমরা তাকে এখন থানাতে রাখব। ওই যে সেন্ট্রাল জেল আছে ওই জেলে রাখবো আমরা। এই বলে নিয়ে গেল। তারপর আমার মা দুই দিন পরে লোকজনকে বলছে যে, কাকে বলবে? কেউ তো সেখানে নাই, কাকে বলে তার স্বামীকে উদ্ধার করবে। উর্দুভাষী যারা সেখানে ছিল সবাই ভাবছে পালিয়ে যাব, ইয়ে করব। তো আমার মা দুই ভাই আর দুই বোনকে নিয়ে একদম সকাল থেকে, প্রতিদিনই, সকাল থেকে ওই সেন্ট্রাল জেলের গেটের কাছে দাঁড়ায়ে থাকতেন। দেখি কি হয়, যদি আমি রিকোয়েস্ট করে সবাইকে বলি যে, আমার স্বামী ভেতরে আছে, তাকে বের করে দাও। তারপর ওখানে গিয়ে দেখলেন ওখানে অনেক মহিলা আছে, অনেক উর্দুভাষী মহিলা আছেন যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা, সকাল থেকে রাত তারপর আবার সকাল থেকে রাত দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তাদের স্বামীকে ফিরে পাচ্ছেন না। এমনও দিন গেছে যে ওখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তারা তাদের স্বামীর লাশ নিয়ে ফিরেছেন, লাশ দেখছেন, বা এমন লাশ যে যার ডেডবডি আছে কিন্তু মাথা নাই। এরকম অবস্থা। তো আমার মায়ের চিন্তা আরও বাড়লো। হয়তোবা, উনি যেটা বললেন, মনে করতেন তার স্বামীকে আর ফিরে পাবেন না। কিন্ত তারপরও ভাবতেন যদি মেরেই ফেলে তাহলে অন্তত লাশটা যাতে পান, যাতে তিনি দেখে, তার ছেলেমেয়ে দেখে অন্তত সান্ত্বনা পাবেন যে তার স্বামী মারা গেছে। প্রায় চার পাঁচদিন থাকার পরে, ওখানেই আছেন, ওখানেই ছিলেন, থাকার পরে, উনি একদিন লাকিলি আমার মা যেটা বলল, যে একজন ইন্ডিয়ান আর্মি দেখলো যে আমার দুই ভাই আর দুই বোন দাড়িয়ে আছে, খুব ছোট ওরা আর খুব সুন্দর ওরা। আমার মা কাঁদতেছে, বোরখা পরে আছে, তো ওই ইন্ডিয়ান আর্মির একজন আমার মাকে ভোজপুরী ভাষায় জিজ্ঞেস করল, ভোজপুরী হলো বিহারের ভাষা, পাটনাতে আমার মা বাবা যে ভাষাতে কথা বলতেন, তো উনি বললেন কি অবস্থা তোমার। তো আমার মা বলল, দেখ ভাই আমি তো তোমার দেশের লোক, আমরা পাটনাতে, আমার স্বামীর পাটনার লোক, আমিও পাটনাতে বিলঙ করি, আমাদের এই গ্রাম আছে, আমরা এখানে থাকতাম, এই অবস্থা, আমার স্বামীকে নিয়ে গেছে আজ চারদিন হলো। কিন্তু আমি কোন খোঁজ পাচ্ছি না। ওই ভদ্রলোকটা বললেন, উনি হিন্দু ছিলেন,

ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন, কিন্তু বিহার থেকে ছিলেন, লাকিলি বিহারে বিলং করতেন, তো উনি বললেন, আমাকে বলো তোমার স্বামীর নাম কি আর তিনি কেমন দেখতে। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি, উনি বলল, বোন আমি আশা দিতে পারব না যে আমি তোমার স্বামীকে জীবিত ফেরত দিতে পারব, কিন্তু উনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে আমি আশ্বাস দিচ্ছিযে উনি রিটার্ন আসবে। এই করে তো আমার মা ওনাকে নামটাম দিলো। তো উনি গিয়ে দেখল যে না লোকটা এখনও জীবিত আছে। বাবার স্টেটমেন্ট হলো যেদিন ওেই লোকটা, ওই ইন্ডিয়ান আর্মি বাবার কাছে গেল, বাবার হাত ধরল এবং বলল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি চুপ করে আমার সঙ্গে চলে আসো। তো আমার বাবা বললেন, ওই দিনই, যে সব বিহারিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদেরকে, সেন্ট্রাল জেলে যারা ছিল রাত বারোটায় লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হতো, মাথা কাটা হতো, এই সিস্টেম চলতো, তো ওই দিনই সন্ধ্যায় আমার বাবাকে ওই ইন্ডিয়ান আর্মি নক করলো, যে তোমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তোমাকে যেভাবে হোক এখান থেকে নিয়ে যাবো। তো ওই রাতেই আমার বাবার সিরিয়াল ছিল, যে এই গ্রুপরা এভাবে রাতে দাঁড়াবে আর তাদেরকে মারা হবে। তারপরও অনেক মারা হয়েছিল, আমার বাবাকে সেই লোকটা চিনতে পারে নাই, শুধু নাম দিয়েই উনি ইশারা করল, না আমিই সিরাজ, আমার নাম মো. সিরাজ। দেখলো যে সারা শরীরে রক্ত আছে। খুব মজার যে বিষয়টা, ছোটবেলায় যেটা দেখেছি, বাবা গোসল করলে মাথার এখানে পানি জমে যেত, মানে এমনভাবে দা দিয়ে ইয়ে করেছিল যে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। তো জিগ্যেস করতাম কি এটা। বলতেন আমি যে জেলে ছিলাম, এখানে লম্বা একটা, প্রায় সোয়া ইঞ্চির মতো একটা দাগ আছে, যেটাতে পানি থাকত, গোসল করলে পানি জমে যেত আবার মুছলে হতো, তো বাবা বলত যে এমন ভাবে ওরা মেরেছিল যে গর্ত হয়ে গিয়েছিল আর প্রচণ্ড রক্তক্ষয় হয়েছে। তো ওই ভদ্রলোক খুব কনিক্যালি কথা বলল, বাবার হাত ধরে, হিন্দিতে কথা বলল, ভোজপুরী ভাষায় কথা বলল, সে কনফার্ম করল যে হ্যাঁ সেই তার ইয়ে। করে তাকে কোনভাবে গেটের সামনে নিয়ে আসল। নিয়ে আসার পরে আমার মায়ের হাতে তুলে দিল। বলল, দেখ বোন আমি তোমাকে যে বলে ছিলাম, তোমাকে আমি যা ওয়াদা করেছিলাম যে তোমার স্বামী জীবিত থাকলে আমি তাকে নিয়ে আসব,

দেখ নিয়ে আসছি। কিন্তু এই যে এখান থেকে আর এক পাও আমি তোমার দায়িত্ব নিতে পারব না। তুমি জানো দেশের অবস্থা কি হয়েছে, এবং বাঙ্গালিরা কিভাবে রিভেঞ্জ নিচ্ছে, এখান থেকে তোমার দায়িত্ব, তুমি তোমার স্বামীকে কিভাবে আগায় নিয়ে যাবা। তো বলল, এখন আমি কি করবো বলো। তো তখন উনি বললেন আমার মাকে, তোমাদের অনেকগুলো লোকজনকে এখন নুরজাহান রোডে, মোহাম্মদপুর তুমি চলে যাও, ওখানে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেডক্রস আইসিআরসি অনেকগুলো ক্যাম্প করে দিয়েছে, তুমি কোন যদি ওই ক্যাম্পগুলোতে একবার ঢুকতে পারো তাহলে তোমরা বেঁচে যাবা। নইলে ওই ক্যাম্পের বাইরে থাকলে কোন না কোন ভাবে তোমরা সবাই মারা যাবা। তোমরা বাঁচতে পারবা না। তো এখান থেকে টেকনিক্যালি তাকে নিয়ে যাবা। তুমি যে কোনভাবে ওই ক্যাম্পে ঢোকো। তো তোমরা যাবা কিভাবে? দেখ, তুমি যে বোরখা পরে আছো, তোমার স্বামীকে সে বোরখা দিয়ে দাও। তাকে কোনভাবে পরায় দাও, পরায় দিয়ে তুমি বাচ্চা নিয়ে কোনভাবে আস্তে আস্তে, এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, এখন তো রাতের সময়, তুমি অন্ধকারে নিয়ে চলে যেতে পারো। মা ঠিক সেই কাজই করলেন, যে উনাকে নিজের বোরখা দিয়ে দিলেন। বোরখা পরিয়ে কোনভাবে ওনারা নুরজাহান রোডে চলে আসলেন। নুরজাহান রোডে এসে উনারা ওই উদ্বাস্তু ইয়েতে ঢুকলেন, আইসিআরসি, ওখানে উনি রেজিস্টার করলেন। উনার নাম এন্ট্রি করলেন। রিফিউজি হিসেবে আবার। করার পরে উনারা আবার লাইফ স্ট্রাগল করা শুরু করলেন। ওখান থেকে আবার ওই ক্যাম্পটা, নুরজাহান রোডে যে ক্যাম্পটা ছিল, ওটা ছিল খুব টেম্পোরারি ক্যাম্প। ওই ক্যাম্প থেকে আবার সবাইকে আনা হলো জেনেভা ক্যাম্পে, ১৯৭২ তে। যখন নিয়ে আসা হলো জেনেভা ক্যাম্পে, সবাইকে আট বাই আট ফিটের একটা রুম দেওয়া হলো। তো আমার পরিবারও ওই রুমটা পেল। রুমটা পাওয়ার পরে লাইফ আবার স্ট্রাগল করা শুরু করলো। শুরু করার পর আবার তো বাঁচতে হবে, যে ক্যাম্পে আছি। আর এখন তাদের ভিতরে যে ভয়টা কাজ করছিল যে,হয়তোবা যদি আমরা এখানে থাকি, আমাদের মেরে ফেলা হবে। আমরা বাঁচতে পারবো না। তখন আইসিআরসি এই কমিউনিটিকে একটা অপশন দিয়েছিল যে এখন তোমরা কি করবা? এই ক্যাম্প, এই রিফিউজি ক্যাম্প তো ফর দ্য টাইম বিয়িং, অল্প

সময়ের জন্য। আমরা তোমাদের শেল্টার দিচ্ছি, কিন্তু আসলে সল্যুশনটা কি? তোমরা যেখান থেকে আসছিলা, ইন্ডিয়া থেকে, সেখানেই ব্যাক করবা? নাকি পাকিস্তান যাবা? নাকি এই দেশেই থেকে যাবা, বাংলাদেশে? তখন ম্যাক্সিমামরাই কিন্তু তাদের জানের ভয়ে অপশন দিলো না আমরা ইন্ডিয়াও ব্যাক করবো না, এদেশেও থাকবো না, আমরা পাকিস্তান যাবো। এটা ছিল আনঅফিশিয়াল একটা অপশন। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ফর রেডক্রস, তারা একটা অপশন নিয়েছিল। তারা একটা ফর্ম ফিলাপ করলো যে না এইসমস্ত উর্দুভাষী যারা বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে, এরা আর বাংলাদেশে থাকবে না, এরা পাকিস্তান যাবে বা ইন্ডিয়াতেও ফেরত যাবে। এই অপশন দেওয়ার পরে তারা নেগোসিয়েশন শুরু করলো পাকিস্তান সরকারের সাথে। যে আসলেই তোমাদের এতগুলো লোক, তোমরা তো চলে গেলে এদেরকে ছেড়ে, একটা পর্যায়ে তোমরা তো তাদের ইউজ করলে, যে তাদেরকে মিত্রবাহিনী হিসেবে ইউজ করলা তারপর ওদেরকে ফেলে চলে গেলা। এখন এদের দায়িত্ব কে নেবে? প্রায় ছয় লাখের মত উর্দুভাষী ছিলো তখন। যারা আটকে পড়েছিল, যারা ক্লেইম করেছিল না আমরা এদেশে থাকবো না, ইন্ডিয়াতেও থাকবো না, আমরা পাকিস্তান চলে যাবো। তখন কিন্তু পাকিস্তান গভর্নমেন্ট একদম ক্লিয়ারলি, পরিস্কারভাবে ডিনাই করলো। বলল, না এটা কিভাবে হয়? এখন যারা বাংলাদেশে আছে তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এরা বাংলাদেশি। দেশভাগ হয়েছে। আমরা কিভাবে সাতকোটি বাঙালিকে বলবো, সাতকোটি বাঙালি যদি পাকিস্তান আসতে চায়, আমরা কিভাবে তাদেরকে আনবো? এটা তো সম্ভব নয়। পাকিস্তান দুটো অংশ ছিল, পশ্চিম-পূর্ব পাকিস্তান ছিল, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়েছে। এখান ওখানে যারা আছে তারা ওভাবেই থাকবে। কিন্তু আইসিআরসি অনেক বড় একটা অর্গানাইজেশেন ছিল, তারা প্রেসারাইজ করলো, এটা কিভাবে বলা যায়? এই যে ভিন্ন একটা জাতি, ভিন্ন জাতিস্বত্তার একটা লোক, ভিন্ন একটা কম্যুনিটি যারা এখানে আছে তারা তো খুব ব্যাকওয়ার্ড সিচুয়েশনে আছে, রিভেঞ্জের মধ্যে আছে, তাদেরকে ছেড়ে দিলে তারা তো মারা যাবে সবাই। এদের দায়িত্ব তো তোমাদেরকে নিতে হবে। তারা বলল যে না আমরা সবাইকে নিতে পারবো না। এই বলে আইসিআরসির প্রেসারাইজে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট একটা ট্রিপার্টিইড অ্যাগ্রিমেন্ট করল নাইন্টিন

সেভেন্টি ফোরে সিমলাতে। সিমলাতে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট হলো। ওই অ্যাগ্রিমেন্ট পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া, যার কারণে ট্রিপার্টাইড বলা হয়েছে। তিন পার্টি মিলে ডিসাইড করল এই যে নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আছে যারা ভারতের কাছে আটকে পড়েছে, এদেরকে কিভাবে নিবা? এবং যারা নিজেদেরকে আটকে পড়া পাকিস্তানি বলছে, যারা নিজেদেরকে উর্দুভাষী বিহারি বলছে এই কমিউনিটি তোমরা কিভাবে নিবা। তখন ওই অ্যাগ্রিমেন্টে পাকিস্তান কিন্তু টেকনিক্যালি তাদের দিকটাকেই দেখেছে। যেটা যে নব্বই হাজার আর্মি ছিল, ওই ইস্যুতেই জোর দিয়েছে তারা এবং বিহারিদের ক্ষেত্রে বলেছে তারা যে টেকনিক্যালি আমরা পাকিস্তানি তাদেরকে বলতে পারি না কারণ সাত কোটি বাঙালিও তো পাকিস্তানে ছিল। তার মানে কি আমরা সাতকোটি বাঙালিকেও পাকিস্তানে নিব? না। তারা কি করলো, তারা তিনটা ক্যাটেগরি লঞ্চ করলো, তারা বলল, এই তিনটা ক্যাটেগরি যারা ফুলফিল করবে তারা হবে আটকে পড়া পাকিস্তানি বা স্ট্রানডেট পাকিস্তানি আর আদারওয়াইজ সবাই হবে বাংলাদেশের নাগরিক। আর তারা পূর্বেই জেনেছিল, তাদের ভালো আইডিয়া ছিল যে, এই যে উর্দুভাষী বিহারি কম্যুনিটি তারা কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক লোকজন ছিল যারা পাকিস্তান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এমপ্লয়ি ছিল, তারা সবাই ছিল রেলওয়ে বেসড। আর রেলওয়ে তখন ছিল প্রোভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টে। এরা বলল ঠিক আছে আমরা আটকে পড়া পাকিস্তানি বলব তিনটা ক্যাটেগরিতে, তিনটা ক্যাটেগরি কি ছিল, প্রথমটা তারা বলছে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানে জন্মগ্রহন করেছে তারা যদি সেভেন্টি ওয়ানের পরে কোনভাবে বাংলাদেশে আটকে যায় তারা হবে আটকে পড়া পাকিস্তানি এবং তাদেরকে পাকিস্তান নিতে বাধ্য। এবং পাকিস্তান নিবে। এবং সেকেন্ড যেটা ছিল যে যারা ছিল পাকিস্তান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এমপ্লয়ি, প্রোভিন্সিয়াল না। তারা হবে আটকে পড়া পাকিস্তানি এবং পাকিস্তান তাদেরকে রি পার্টিয়েড করবে। থার্ড হলো তারা যেটা বলল, যে পঁচিশ হাজার যে ইন জেনারাল সাধারণ লোককে নেবে তারা যারা যুদ্ধে তাদের পরিবারের লোককে হারিয়ে ফেলেছে। এটা কোন ক্রাইটেরিয়া নয় কিছু নয়। জাস্ট পঁচিশ হাজার লোককে তারা নিয়ে পাকিস্তানে রি পার্টিয়েট করে দেবে। এই হল তিনটা ক্যাটেগরি। এখন এই তিনটা ক্যাটেগরি যদি কেউ ফুলফিল না করে তাহলে ওই অ্যাগ্রিমেন্ট কিন্তু বলে দিচ্ছে আপনি কোনভাবেই ক্লেইম করতে পারবেন না

যে আপনি আটকে পড়া পাকিস্তানি বা আপনি পাকিস্তানের নাগরিক। অ্যাকর্ডিং টু সিমলা অ্যাগ্রিমেন্টে তারা কিন্তু নিল, যারা ওয়েস্ট পাকিস্তানে জন্মগ্রহন করেছে এখানে আটকে গেলে তাদেরকে নিয়েছে, যারা সেন্ট্রাল গভর্নেমেন্টের এমপ্লয়ি ছিল তাদেরকে নিয়েছে এবং পঁচিশ হাজার সাধারণ জনগণের কথা যখন আসলো তখন এখানে কি হলো, যারা রিফিউজি ক্যাম্পে ছিল, তারা সেইখান থেকে পঁচিশ হাজার না দিয়ে তৎকালীন আওয়ামি লীগ সরকার দেখলো যে উর্দুভাষীদের মধ্যে যার গুন্ডা টাইপের ছিলো, যারা ওয়্যার ক্রিমিনাল ছিলো, যারা প্রত্যক্ষভাবে বাঙালি নিধন করেছে, তারা কিন্তু জেলে ছিল, ওই জেলে থেকে পঁচিশ হাজার লোককে ধরে ওই কোটাতে পাঠায় দিলো। অথচ ওই যারা গেল তাদের কিন্তু ট্রায়াল হওয়া উচিৎ ছিল। যারা নিরীহ ছিল তারা ক্যাম্পে থেকে গেলো আর যারা কালপ্রিট ছিল, যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তাদেরকে ওই পঁচিশ হাজার কোটায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনটা কোটাই তাদের ফুলফিল হয়ে গেল এবং পাকিস্তান ক্লিয়ার। বলে দিলো যে না আমাদের আর কোন কোটা নাই। আমরা এই কম্যুনিটিকে আর পাকিস্তানি বলতে পারব না। এখন তোমাদের দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব, এখন বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে দেখবে যে এই কম্যুনিটিকে তারা কিভাবে রাখবে। কিন্তু চমৎকার বিষয় দেখবেন, আজও উর্দুভাষীরা কিন্তু বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে। বাংলাদেশে প্রায় একশ ষোলটা ক্যাম্প আছে এই ক্যাম্পে প্রায় তিন লাখের মতো উর্দুভাষী আছে যারা একটা ইনহিউম্যান লাইফ কিন্তু তারা লিড করছে, একটা অমানবিক পরিবেশ,তাদের আট ফিট দশ ফিটের একটা ঘর, এডুকেশন নেই, তাদের ভালো স্যানিটেশন নেই। অথচ সেভেন্টি ফোরেই কিন্তু এটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ নিজেই সাইন করেছে যে না এই তিনটা ক্যাটেগরির পরে আর কেউ পাকিস্তানি নাগরিক না। তারপরেও কিন্তু দেখা গিয়েছে সরকার একটা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রেখেছে তাদের যে তোমরা অপশন দিয়েছো পাকিস্তান যাবার, পাকিস্তানে যাবা। সরকারের কোন মাথাব্যাথা নাই। তার তো অপশন দিয়েছে। সেভেন্টি ফোর থেকে টু থাওজেন্ড ওয়ান পর্যন্ত যেটা আমরা উপলব্ধি করেছি যে বাংলাদেশ সরকার কোনভাবেই উপলব্ধি করে নাই যে এরা তাদের একটা অংশ। তারা মেনে নিয়েছে, যে এরা অপশন দিয়েছে, এরা আমাদের অংশ না। এরা এদেশকে বিলং করে না এরা পাকিস্তান যাবে।

কিন্তু অপশনটা ছিল আনঅফিসিয়াল। যেটা প্রমাণ করেছি আমরা। আমরা যখন এই জেনেভা ক্যাম্পেই বড় হলাম, সকালে উঠলেই যেন শুনতে পাই আমরা এ দেশের নাগরিক না। আমরা পাকিস্তানি,আমরা পাকিস্তান যাবো, কেন আমরা বাংলা পড়তেছি, কেন বাংলা স্কুলে যাচ্ছি। অনেকগুলা বাধা বিপত্তি। কিন্তু আমরা আমাদের এডুকেশনগুলো চালাতে লাগলাম যে না আমরা পড়ব। আমরা দেখি কি হয়। যদি পাকিস্তান যেতে পারি তো চলে গেলাম। যদি এখানে থাকি তো থাকলাম। তো আমরা তখন প্রায়, আমাদের গ্রুপের, জেনেভা ক্যাম্পের প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন ছেলে আমরা বের হলাম। তারপর এসএসসি পাশ করলাম, এইচএসসি পাশ করলাম উনিশ শো নিরানব্বই সালে। তো এসএসসি পাশ করার মধ্যেই কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের, আমার ক্যাম্পের স্কুল থেকে বের হয়েছি, ক্যাম্পের স্কুলটা হলো কেজি থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত আমাদের রেজিস্ট্রেশন নাই, আমরা এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারব না। তখন আমাদেরকে অন্য স্কুলে যেতে হবে। তো যখন আমরা, জেনেভা ক্যাম্প থেকে প্রায় বিশ জনের মতো আমরা, বের হলাম, না যে আমাদের বাইরের স্কুলে যেতে হবে। আমরা গেলাম বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলে। নুরজাহান রোডের যেটা আছে। ওখানে গিয়ে আমরা অ্যাডমিশন নিলাম। তো ফার্স্টটাইমে, আমাদের ক্যাম্পের যে স্কুল ছিল সেটা একদম ভিন্ন পরিবেশ, সেটা আমাদের মতো ছিলো, টিচাররা ছিলেন উর্দু স্পিকিং, তারা বাংলা পড়াতেন কিন্তু উর্দু স্পিকিং ছিলেন, ইংরেজি যে প্রনানসিয়েশন ছিলো সেটা আমাদের মতো ছিলো। তো ফার্স্টটাইম যখন আমরা, আমরা ইভেন কোনদিন পিটি করি নাই, কোন জাতীয় সঙ্গীত গাই নাই, আমাদের ক্যাম্পের স্কুলে, অথচ আমরা তখন ক্লাস এইটে পড়ি। ফার্স্ট টাইম যখন আমরা অ্যাডমিশন নিলাম, পরে ক্লাস শুরু হয়েছে আমাদের, প্রথম দিন, আমরা ক্লাস নাইনে অ্যাডমিশন নিয়েছি, সবাই চলে আসছি আমরা, মাঠে দাড়িয়েছি, এখন কি হবে জাতীয় সঙ্গীত হবে, আমরা বিশজন, একসাথেই আমরা আছি, জাতীয় সঙ্গীত শুরু হলো, আমরা পারছি না, একটা লাইনও আমরা পারছি না, মানে আমার সোনার বাংলা আমরা জানি না, আমরা বিলং করি না, এই গান আমার জন্য কিনা, সবাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি, পুরো স্কুলের বাকিরা আমার সোনার বাংলা গাইছে, আমরা দাঁড়িয়ে, আমরা পারছি না কিছু, সবাই আমাদেরকে ফলো করতেছে, যে এরা চুপ কেন।

তারপর টিচাররাও অবজার্ভ করলো যে এরা পারছে না, তো জাতীয় সঙ্গীত যখন আমরা পারছি না, তখন জাস্ট ওই মর্নিং সেশনটা শেষ করে আমরা ক্লাসে আসলাম, আসার পরে ছেলেদের মধ্যে একটা নেগেটিভ ধারণা শুরু হয়ে গেল, যে এরা তো বিহারি, এরা তো ক্যাম্পে থাকে, এদের বাবারা আমাদের দুশমন ছিলো, এই সেই কথাগুলো চলে আসে। আর খুব ইন্টারেস্টিং যে স্কুলে কিন্তু তিন রো থাকতো, এভাবে এভাবে এভাবে তিনটা রো, তো আমরা কিন্তু একটা রোতেই বসতাম, আমরা যেহেতু বিশজন, যেহেতু আমরা একসাথে থাকি, আমরা একটা রোতে থাকি, আর এই দুইটা রো কিন্তু টোটাল বাঙালি স্টুডেন্টদের। তো তখন যারা বলছে, আমরা কিছু বলতে পারছি না, আমরা অসহায়, ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে তারা আমাদেরকে ট্রিট করছে। তো একটা পর্যায়ে আমরা মারামারি করলাম, কারো নাক ফেটে গেল, কারো মুখ ফেটে গেল, রক্তাক্ত অবস্থা হয়ে গিয়েছে। আর ওই স্কুলে, বেঙ্গলি মিডিয়ামে, তিন চারজন হিন্দু টিচার ছিলেন, তারা কিন্তু আমাদের পেইনগুলা বুঝতে পেরেছিলেন, যে না কিন্তু আসলেই তারা তো ভিক্টিম, যে নাইটি সিক্সে, না, নাইন্টি ফোরে ক্যাম্প থেকে আমাদের স্কুলে আসছে। তো তারা আমাদের সবাইকে নিয়ে বসলেন, বুঝালেন যে, দেখ তোমরা ওদেরকে বলছো, ওদের কি দোষ, ওদের দাদা কি করেছে, বাবা কি করেছে সেই নিয়ে ওদেরকে তো বলার কিছু নেই। তারা তো নিষ্পাপ, তারা তো তোমাদের মতই, তারা চেষ্টা করছে যে লেখাপড়া করে এই দেশেই থেকে যাবে, এখানেই এগিয়ে যাবে বা তারা পাকিস্তান চলে যাবে, চলে গেলে যাক কিন্তু তাদেরকে পড়তে দাও, ওদের সাথে বন্ধুত্ব করো, ওদের তো কোন দোষ নাই। এই বলে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হতে শুরু করলো, যে আমরা মিশতেছি, আমরা আর এক সাইডে বসি না, আমার চারটা ফ্রেন্ড হয়েছে, ও এদিকে আসছে, আমি ওদিকে বসছি, বসার পরে দুইটা বছর আমরা ক্লাস নাইন টেন পার করলাম। এখন পালা চলে আসল রেজিস্ট্রেশনের, যে এসএসসির আগে রেজিস্ট্রেশন করতে হব ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনে অ্যাড্রেস দিতে হবে, তখন টিচাররা বসলেন, যে জেনেভা ক্যাম্পের অ্যাড্রেস দিলে বোর্ড থেকে হয়ত অ্যালাউ করবে না, তখন কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টশিপ নিয়ে কিন্তু কোন কথা হয় নি, আলাপ আলোচনা হয় নি। মাত্র নাইন্টি ফোর নাইন্টি ফাইভের কথা। তো ক্যাম্পের

অ্যাড্রেস দেওয়া যাবে না। তখন আমরা বললাম আমরা কি করবো, আমরা কোন অ্যাড্রেস দিবো, তখন মাধব স্যার নামে একজন হিন্দু টিচার ছিলেন আমাদের, উনি ম্যাথ নিতেন, তখন তিনিই বললেন, না ঠিক আছে তোমরা পাঁচজন আমার বাসার অ্যাড্রেস দাও। তখন উনাকে দেখে আরও একজন ছিলেন, খলিল স্যার, উনি ভুগোল নিতেন, উনি বললেন ঠিক আছে আমার বাসার ঠিকানা পাঁচজন দাও। এভাবে করে তিন চারজন স্যার মিলে আমাদের বিশ জনকে কাভার করে ফেললেন। যে তোমরা আমাদের তিন চারজনের অ্যাড্রেস দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করো। আমরা করলাম, করার পরে পাশ করলাম, বেরিয়ে আসলাম। কলেজে গেলাম, তখন একটু বুদ্ধি হয়েছে, যে আমরা এখানেই আছি, এদেশেই আছি, কিন্তু বাবা মা বলেছে পাকিস্তানে যাবে, ক্যাম্পের লোকজন। তখন এসপিজিআরসি নামে একটা সংগঠন ছিলো, তারা খুব জোর সোর ইয়ে করছে যে, আধা রুটি খায়েঙ্গে, পাকিস্তান জায়েঙ্গে। মানে পাকিস্তান যাবেই যাবে তারা, তো এটা ছিল একটা ফ্রড প্রসেশন, একটা ফ্রড একটা আশ্বাস, তারাও কিন্তু বুঝতে পেরেছিল যে এই জাতিকে আর কখনই পাকিস্তানে নেওয়া যাবে না। তারাও কিন্তু ট্রিপার্টাইড অ্যাগ্রিমেন্ট পড়েছে, জেনেছে, কিন্তু সামহাউ যেটা আমরা রিয়ালাইজ করলাম যে, পাকিস্তান গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং তৎকালীন যে একটা অপোজিশন যারা ছিলো তারা কিন্তু আমাদের নিয়ে বড় একটা গেইন করেছে, বড় একটা রাজনীতি করেছে, যে এই কমিউনিটিকে নিয়ে। যেমন আমি বলতেই পারি যে, জামাত কখনই চায়নি যে এই কমিউনিটি পাকিস্তানে চলে যাক বা এরা এখানেই এস্টাবলিশড হয়ে যাক। যার কারণে যে এসপিজিআরসি যে অর্গানাইজেশন ছিল, যারা বলত যে আমরা পাকিস্তানে চলে যাবো, তাদেরক কিন্তু তারা মদত করত, যে তোমরা তোমাদের এই ভয়েসটা চালায় যাও, তুঙ্গে রাখো। কেননা তারা মনে হয় চেয়েছিল যে এরা যদি এখানে এক্সিস্টিং থাকে, তাহলে যুদ্ধাপরাধের টোটাল ব্লেমটা তাদের ওপরে যাবে, যে এরাই তো লাইভ, এরাই তো ওটা করেছে, যার কারণে এরা এখানে আছে, কিন্তু এখন সেটা মিথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে। যেটা আমরা এখন দেখছি, যে যুদ্ধাপরাধের বিচার হচ্ছে, ট্রায়াল হচ্ছে, ফাঁসি হচ্ছে। অথচ যে লিস্ট হয়েছে ওই লিস্টে কিন্তু যে একশষোলটা ক্যাম্প, জেনেভা ক্যাম্প রয়েছে, তার একজনও উর্দুভাষীদের নাম

আসবে না। ওই লিস্টে আমরা দেখেছি যে তিন থেকে চার জন উর্দুভাষীদের নাম ছিলো। যারা এখন জীবিত নেই, যারা পাকিস্তান চলে গেছে, যারা পালিয়ে গেছে। তো এই কমিউনিটি নিয়ে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট ছিনিমিনি করেছ, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট, এরা জেনেই গিয়েছিল যে এরা বাংলাদেশের নাগরিক, এদেরকে সিটিজেনশিপ দিয়ে দেওয়া উচিৎ, এদেরকে মেনে নেওয়া উচিৎ কিন্তু তারা মানে নাই। আর অপোজিশন যারা ছিলো তারাও চেয়েছে যে তোমরা এভাবে চিল্লাফাল্লা করো। তৎকালীন পর্যন্ত কোন ইউথ গ্রুপ ওইভাবে উঠে আসে নাই। যে এই কমিউনিটিকে তার যে আসল ঠিকানা সেই ঠিকানায় নিয়ে যেতে হবে। আমরা যখন উনিশশো নিরানব্বই সালে এইচএসসি পাশ করলাম, পাশ করার পরে আমরা ডিসাইড করলাম, না আমরা এই কম্যুনিটির দিকগুলো বিবেচনা করব, কোথায় যাব আমরা, আমরা কি রিয়্যালি আমরা কি পাকিস্তানি? না আমরা বাংলাদেশের নাগরিক? তখন ফার্স্টটাইম আমরা চিন্তা করলাম যে, আমরা লোকজনের সাথে আলাপ করবো, যে আমাদের গাইড করে, যদি পাকিস্তান যাওয়া হয়, তাহলে আমরা পাকিস্তানের জন্য ফাইট করবো, আমরা লেখালেখি করবো, আমরা লিগালি অ্যাপ্রোচ করবো, যদি না হয় তাহলে বাংলাদেশি হওয়ার জন্য আমরা অ্যাপ্রোচ করবো। তো ফার্স্টটাইম আমরা, আহমেদ ইলিয়াস নামে একজন আছেন, উর্দুভাষী একজন কবি, এবং তখন আলফালাহ বাংলাদেশ নামে একটি এনজিও, এখনও আছেন, উনারা জেনেভা ক্যাম্পে আলফালাহ মডেল ক্লিনিক নামে একটি ক্লিনিক চালাতেন, ওই ক্লিনিকে তখন তারা এইচআইভি-এইডস নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। আর ওই এইচআইভি প্রোগ্রামে আমরা যেতাম, যাওয়ার পরে উনার কিছু পজেটিভ দিক আমরা শুনতান, উনি তো উর্দুভাষী, উনি যখন আমাদের মতো ইউথদেরকে পেতেন এইচআইভি প্রোগ্রামে তখন তিনি এইচআইভির মেসেজের পাশাপাশি, টেকনিক্যালি হালকা টাচ করতেন যে তোমরা এদেশের নাগরিক, তোমরা পড়াশুনা করতেছো, তোমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তো আমরা একটু সাহস করলাম যে, যাই না আমরা উনার কাছে যাই, তো জেনেভা ক্যাম্প থেকে আমরা, পনের থেকে ষোল জন, যারা সদ্য এইচএসসি পাশ করেছি, এখন ডিগ্রিতে ভর্তি হবো, অনার্সে ভর্তি হবো, আমরা উনার কাছে গিয়ে বললাম, আমরা জানতে চাই, আমরা কি করবো? তো উনি খুব স্পষ্টভাষায় বললেন,

তোমরা ফার্স্টটাইম এই কম্যুনিটি থেকে, উনিশশো একাত্তর থেকে এই দু হাজার সালে, তোমরা আসছো আমার কাছে, এবং তোমরা আরো অন্যান্যদের কাছে যাবা, নিজেদেরকে জানবা, নিজেদেরকে বুঝবা, তোমরা পাকিস্তানি না, আমি লিখিত দিয়ে দিলাম, তোমরা এদেশের নাগরিক, তোমার অধিকার সমান, একজন বাঙালির, একজন আদিবাসীর যে অধিকার তোমার অধিকারও সমান, তোমরা এখানেই নিজেদেরকে এস্টাব্লিসড করবা, কিন্তু এই দায়িত্ব তোমাদেরকে নিতে হবে, তোমরা যে কয়েকজন আসছো, এখান থেকে হয়ত কেউ ঝরে যাবে, হয়ত একজন টিকে যাবে, হয়ত চারজন টিকে যাবে, কিন্তু তোমাদেরই নিতে হবে দায়িত্ব। তা আমরা বললাম ঠিকাসে আমরাই দায়িত্ব নেব, কি করতে হবে? তো উনি প্রথমেই দুইটা নাম দিলেন আমাদের, দুইজন, বললেন তোমরা প্রথমেই এই দুইজনের সাথে দেখা করবা, কোন দুই জন? একজন হলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. সি আর আবরার, ইন্টারন্যাশনার রিলেশন ডিপার্টমেন্টের, উনি বললেন উনার কাছে যাবা তোমরা, তারপর যাবা কবি আসাদ চৌধুরীর কাছে, এই দুই জনকেই আমি চিনি এবং এই দুইজনই হলেন উর্দুভাষীদের প্রতি সহানুভুতিশীল, এই দুজন তোমাদেরকে গাইড করবে, তো প্রথমেই আমরা চিন্তা করলাম, যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ব্যাপার আছে, ওখানেই যাই। তো খুব ভালোভাবে মনে আছে আমাদের, আমরা ফেব্রুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখে ওখানে গেলাম, ফোনে ফোনে ড. আবরার আমদের অ্যাপয়েনমেন্ট দিলেন, দেওয়ার পরে আমরা গেলাম, পরে আমার উনাকে বললাম, বলার পরে উনি খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন, যে ফার্স্টটাইম জেনেভা ক্যাম্প থেকে এতগুলো ইউথ চলে আসছে, তো বললেন ঠিক আছে, আমরা তোমাদের সাথে আছি, তোমরা তোমাদের স্ট্রাগলটা শুরু করো, প্রথমে কি করতে পারি-আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারকমিউনিটি একটা ডায়ালগ রাখি, যেখানে তোমরা চারজন স্পিচ দিবা চারটা স্পেসিফিক ইস্যু নিয়ে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা ইউথদেরকে ডাকবো, তারা কথা বলবে, এবং ডাকবো কিছু ইন্টেলেকচুয়ালদের, কাদেরকে ডাকবো? ড. শাহদীন মালিককে ডাকবো, যেহেতু উনার ফ্রেন্ড এবং ড. হাসান আরিফকে ডাকবো, যিনি অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন, হাসান আরিফ। তো আমরা প্রিপারেশন নিলাম আমরা গেলাম, আমি একটা স্টেটমেন্ট দিলাম,

আমার ফ্রেন্ড হাসান, সে একটা স্টেটমেন্ট দিলো, পাপ্পু আরেকজন, শাবানা আরেকজন, চারজন আমরা স্টেটমেন্ট দিলাম। ওই স্টেটমেন্ট দেওয়াতে প্রথমবার আমাদের মনে হল, না, আমরাও এদেশের অংশ, এদেশ আামারও, ওখান থেকেই আমরা স্ট্রাগল শুরু করলাম, আমরা একটা অ্যাসোসিয়েশন করলাম, অ্যাসোসিয়েশন অফ ইয়াং জেনারেশন অব উর্দু স্পিকিং কম্যুনিটি। আমি তখন ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট, এখনও আছি। আমি প্রেসিডেন্ট হলাম, আমরা বিশ-ত্রিশ- চল্লিশজনকে নিয়ে শুরু করলাম, কি করলাম? যে জাতীয় দিবসগুলো আছে সেগুলো আমরা অবজার্ভ করবো, একুশে ফেব্রুয়ারি, ষোলই ডিসেম্বর, পহেলা বৈশাখ এগুলো আমরা করবো, করতে করতে আমাদের সার্কেলগুলো বাড়লো। আমরা অনেক বাঙালি ইন্টেলেকচুয়ালদের সাথে দেখা করলাম। তারই মাঝে আমরা গেলাম কবি আসাদ চৌধুরীর বাসায়, উনি তখন থাকতেন গ্রিনরোডের বাসায়, তো উনি তো মহাখুশি, এতদিন পর এত গুলো ইউথ আসছে, তো উনি ফার্স্টটাইম আমাদের কথা শুনে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন, করে বললেন, তোমরা আগায় যাও, আমরা তোমাদের হেল্প করব, তোমরা আমার চেয়েও বড় একজন বাংলাদেশি - এটা আমি বিশ্বাস করি। বলে, উনি চা নাস্তা খাওয়ানোর পরে পাঁচশ টাকা আমাদেরকে দিলেন, বললেন তোমরা কাগজ কলম কিনবা, তোমরা প্রতিমাসে বসবা, বসে বসে এই কম্যুনিটিকে এই অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসবা। তারপর আমরা গেলাম সিনিয়র অ্যাডভোকেট এম আই ফারুকির কাছে, উনি উর্দু স্পিকিং একজন অ্যাডভোকেট, তার গল্প যদি আমরা বলি আমার মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং হবে, উনিও বিহার থেকে - পাটনা থেকে এসেছিলেন। উনার কাছে যখন গেলাম, বললাম আমরা তো এই কম্যুনিটি থেকে আসছি, উনি বললেন আমিও তো সেই কম্যুনিটি থেকে, তো তোমরা এখন কি চাও?, আমি বললাম যে আমার অধিকার যদি এখানে থাকে, তাহলে সেই অধিকার চাই। তো ঠিক আছে, লিগ্যাল সাপোর্টটা আমি দিবো, তোমরা আগায় যাও। তো উনি ওইদিনই আমাদেরকে একটা গল্প বললেন, বললেন, দেখো আমার জন্ম পাটনাতে, আমি আমার বাবা মায়ের সঙ্গে চলে আসলাম এদিকে, এদিকে আসার পরে আমি এদেশের হয়ে গেলাম, কিন্তু আমি পাটনাতে গিয়ে, আমার গ্রাম থেকে এক টুকরা মাটি নিয়ে আসছি, আর ওই মাটিটা, আমি আমার ছেলেমেয়েদের বলে দিয়েছি, যে আমি

যখন মারা যাবো, তখন ওই মাটিটা আমার কবরে প্রথম দেওয়া হয়। ওই মাটিটা এখনও আছে তার বাসায়। এই যে ইন্টারেস্টিং একটা পেইন আমরা বুঝতে পারলাম তখন, যে একটা লোক তার মাতৃভূমিকে কিভাবে ভালোবাসতে পারে। সেই পাটনা থেকে এই বাংলাদেশ, বাংলাদেশ থেকে সে আবার চলে যাবে, সেই মাটিটা কত মূল্যবান তার জন্য। তো খুব ভালো লাগলো উনার কথা শুনে। ২০০১ চলে আসলো। তখন জাতীয় নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হচ্ছে। খসড়া হচ্ছে। আমরা দেখলাম সবজায়গায়ই গিয়েছে কিন্তু ভোটার তালিকার লোকজন আমাদের ক্যাম্পে আসে নাই, আমাদের ক্যাম্পে ঢুকে নাই, তখন আমরা সাহস করে গেলাম, আমরা বললাম, ইলেকশন কমিশনে গেলাম, আমরা একটা মেমোরান্ডাম লিখলাম, আমাদের প্যাডে, বললাম আমরা বাংলাদেশি, আমরা কিন্তু বলি নাই আমরা বাংলাদেশি না, আমাদের বয়স আঠারো বছর হয়েছে কিন্তু আমাদের নাম ভোটার লিস্টিংয়ে নাই, আমাদের নাম মিসিং আছে, আমাদের নাম ইনক্লুড করো। ওখানে এসবি, এনএসআই এর লোকজন ছিলো, তারা দেখছিল, তারা শুনে আমাদেরকে এমনভাবে ধমক দিলো, তোমাদের সাহস তো কম না! তোমরা পাকিস্তানি হয়েও বাংলাদেশের ভোটার লিস্টে যেতে চাও? তোমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবো আমরা। তখন আমরা সাহস করে বললাম, কেন আমাদের ধরে নিয়ে যাবেন? আমরা একটা মেমোরান্ডাম দিয়েছি, তার উত্তর দিবেন, কেন ধরে নিয়ে যাবেন? আমি তো কোন অপরাধ করি নি, আমি তো বাংলাদেশের নাগরিক, জন্ম আমার এখানেই। তখন অল্প অল্প সংবিধান পড়তে শুরু করেছি আমরা। আমাদের সবার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলো যে আমরা কমার্স নিয়ে পড়ছি, কেউ আর্টস নিয়ে পড়ছি, কেউ সায়েন্স নিয়ে পড়ছি, লিগ্যাল সাইডে কেউ আমরা ঢুকি নাই, যাই নি। তো ওই ধমক খেয়ে আমরা চলে আসলাম, আসার পর আবার অ্যাডভোকেট এম আই ফারুকির চেম্বারে গেলাম, গিয়ে বললাম, স্যার, আমাদেরকে তো এইভাবে ধমক দিয়ে পাঠায় দিলো, কি করবো আমরা? উনি বললেন, উনারা কাউকে ধমক দিতে পারে না, কেন পারে না? লিগ্যালি পারে না, কারণ তোমরা বাংলাদেশের নাগরিক। এই দেশ তোমার। কি করতে হবে? তা একটা লিগ্যাল নোটিশ আমরা দেই। উনি বললেন তোমাদেরকে রিটে যেতে হবে। তখন কিন্তু রিট বুঝি না। তিনি বললেন সংবিধানের একশ দুই ধারা অনুযায়ী কোন

মৌলিক অধিকার থেকে যদি কেউ বঞ্চিত হয় তাহলে এই একশ দুই ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টে গিয়ে রিট আবেদনের মাধ্যমে তার অধিকার পুনরোদ্ধার করতে পারে। তখন কোর্ট কিন্তু, সরকারি যে ডিপার্টমেন্টগুলি আছে তাদের বাধ্য করতে পারে, কেন তুমি তার অধিকারগুলো করছো না। তখন রিটটা বুঝতে পারলাম, আচ্ছা, রিট হল এইটা। তো বললেন যে রিটে যেতে হবে, তোমরা কি যাবা? আমরা বললাম অবশ্যই আমরা রিটে যাব। তো প্রথম কি কাজ হবে রিটে? আমরা একটা লিগ্যাল নোটিশ সার্ভ করবো, কাকে কাকে দেব? ইলেকশন কমিশনকে দেব এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দিবো। যে আমরা দশজন, বাই বর্ন বাংলাদেশি, আমাদের নাম ভোটার লিস্টে নাই, আমাদের নাম ইনক্লুড করতে হবে। আমরা কিন্তু বলছি না, আমরা নাগরিক না। আমরা বলছি আমরা নাগরিক, আমরা উর্দুভাষী, আমরা বিহারি আমরা, আমরা ক্যাম্পে থাকি। আমার নাম মিসিং আছে, আমার নাম ইনক্লুড করো, লিগ্যাল নোটিশ দিলাম, কোন পাত্তা দিলো না, তারপর আমরা আবার সার্ব করলাম, কোন পাত্তা দিলো না। তারপর আমরা ২০০১ সালে হাইকোর্টে দাঁড়ালাম, তারপর আমরা রিট পিটিশন ফাইল করলাম। তখন, মজার বিষয় হলো, একটা কোর্ট আমাদের রিজেক্ট করে দিলো। ওই কোর্ট বলল, না, আমরা এই পিটিশনটা অ্যাক্সেপ্ট করবো না। আমি জানি এরা বাংলাদেশি না, এরা আটকে পড়া পাকিস্তানি, এরা নিজেদের স্ট্র্যানডেড পাকিস্তানি বলে এবং এরা অপশন দিয়েছে, আমার কোর্টে আমি এটা নিবো না। চলে আসলাম, একমাস পরে আমরা অন্য কোর্টে মুভ করলাম। ওই কোর্ট অ্যাকসেপ্ট করলো, করার পর রুল ইস্যু করলো, যে কেন তাদেরকে ভোটার লিস্টে ইনক্লুড করা হবে না। এবং একবছর পর ফিফথ মে ২০০৩ সালে আমরা রায় পেলাম যে, আবেদনকারী দশজন, এরা উর্দুভাষী, এরা বিহারি, এরা ক্যাম্পে থাকে কিন্তু এরা বাংলাদেশের নাগরিক, এদের নাম ভোটার লিস্টে ইনক্লুড করতে হবে, এই বলে কোর্ট ইন্সট্রাকশন দিয়ে দিলো, ইলেকশন কমিশনকে এবং হোম মিনিস্ট্রিকে। অ্যাকরডিং টু দ্য কোর্ট ইন্সট্রাকশন, ইলেকশন কমিশন আমাদের দশজনকে ভোটার লিস্টে ইনক্লুড করলো। ওই সালে, ২০০৩ সালে, আমরা দশজন প্রথম, একটা হিস্ট্রি হলো, একটা আইস ব্রেকিং, যে এই কম্যুনিটি যারা, ইন্টারন্যাশনালি এতদিন জানতো, এরা পাকিস্তানি, এরা পাকিস্তানি, এখন দশজন জেনেভা ক্যাম্প থেকে

বাংলাদেশি হয়ে গেল। কিন্তু ওখানে টেকনিক্যাল সমস্যা আমাদের ড্রাফ্টিংয়ে ছিল যে আমরা বলছি, আমরা দশজন ভোটার লিস্টে নাম ইনক্লুড করতে চাই, দশজন বলেছি আমরা, এজন্য ইলেকশন কমিশন, যখন আরও লোকজন চাচ্ছে আমাদের নাম লিস্টে দাও, তখন বলছে না, কোর্ট বলেছে দশজনকে, আমি দশজন দিবো, দশজনের বাইরে আমি যাব না, এই বলে তারা আটকে দিলো। আটকানোর পরে, ২০০৩ সালে এটা হল তো, জাস্ট পাঁচবছর পরে ২০০৮ সালে, না ২০০৭ সালে যখন গভর্নমেন্ট ফার্স্টটাইম ন্যাশনাল আইডি কার্ড লঞ্চ করলো, এবং তারা বলল, যাদের কাছে জাতীয় পরিচয়পত্র থাকবে, তারা কিন্তু এতগুলো সুবিধা পাবে, তখন আমরা দেখলাম, যদি একজন রিকশাপুলারও যদি ক্যাম্পের হয়, তার যদি লাইসেন্স লাগে, তাহলে ওই আইডি কার্ড লাগবে, সেটা না থাকলে সে লাইসেন্স করতে পারবে না, মানে কোন গতি থাকবে না আমাদের, আমরা কি করবো? তখন আমি জেনেভাতে ছিলাম, সুইজারল্যান্ডে একটা ফেলোশিপে ছিলাম, অ্যাজ এ মাইনরিটি একটা ফেলোশিপে ছিলাম, তিনমাসের একটা ফেলোশিপ নিয়েছিলাম, ওখান থেকে বসে আমি, আমার যারা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল, যারা আমরা গ্রুপে ছিলাম, বললাম যে এটা কি হচ্ছে? আমরা কি করবো? আমরা তো দশজন আইডি কার্ড পেয়ে যাবো, কিন্তু বাকি যারা তাদের কি হবে, তোমরা ওয়ার্ক করো। তখন কিন্তু আমি ফার্স্টটাইম জাতিসংঘতে, উর্দু স্পিকিং ইস্যুতে, এতগুলো ম্যাটেলিয়ালস তারা পাচ্ছিল, অ্যাজ এ ফেলো, আমি মাইনরিটি ফেলো ছিলাম ওখানে, আমার দ্বারা তারা পাচ্ছিল, আমার সুযোগ হয়েছিল, ওখান থেকে বাংলাদেশ মিশনে যারা ছিলো, তারা ফোর্স করছে, না এরা তো বাংলাদেশের নাগরিক, এখন আইডি কার্ড দিতে হবে তাদেরকে। তো সামহাউ ওখান থেকে আমি পুশ করতে লাগলাম, এখান থেকে আমাদের গ্রুপে যারা ছিলেন, তারা আবার মিরপুরে আরেকটা গ্রুপ আছে, ইয়ুথ গ্রুপ, যারা রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে কাজ করছে, উনার নাম সাদাকাত খান, উনাকে লিড করে মিরপুর থেকে আরও এগারোজন আমরা রেডি করলাম, উনারা রেডি হল। উনার ফ্রেশ একটা রিট করল ২০০৮ সালে। উনারা বলল, আমরা যারা উর্দুভাষী বিভিন্ন ক্যাম্পে আছি, ১১৬ টি ক্যাম্পে আছি, আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক, এবং আমরা আমাদের নাম ভোটার লিস্টে ইনক্লুড করতে চাই, এবং আইডি কার্ড পেতে চাই। এখানে বলছে আমরা সবাই, যার

কারণে কিন্তু ওই একই সালে কোর্ট বলে দিয়েছে বাংলাদেশের একশ ষোলটি ক্যাম্পে যারাই বসবাস করছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক, তারা উর্দুভাষী এবং তারা উর্দুভাষী বাংলাদেশি। চমৎকার বিষয় হচ্ছে, প্রথমবার আমরা কোর্ট থেকে আমাদের নমেনক্লাচার পেয়ে গেলাম, যে আমরা বাংলাদেশি, উর্দুভাষী বাংলাদেশি, কোর্ট বলে দিচ্ছে, তারা বাঙ্গালি না, এবং আইডি কার্ড দিতে হবে। তার পর আমরা আইডি কার্ড পেয়ে গেলাম, সবার আইডি কার্ড হলো। সবার ভোটার রেজিস্টেশন হলো। কিন্তু ওই রায়ে কোর্ট আরেকটা কথা বলে দিয়েছে যে, যদি কোন বয়স্ক লোক বা যারা নিজেদেরকে পাকিস্তানি মনে করবে, কোর্ট বলেছে লিভ দেম অন দেয়ার ফেইট, তাদেরকে ছেড়ে দাও নিজেদের অবস্থায়, সে যদি নিজেকে পাকিস্তানি বলে তাহলে ছেড়ে দাও। কিন্তু যে নিজেকে বাংলাদেশি বলছে, যে আইডি কার্ড নিতে চায়, তাদেরকে দাও। ওটাই হয়েছে, এই ২০০৮ জাজমেন্টটা এত ক্লিয়ার একটা জাজমেন্ট,যে একটা কম্যুনিটি কিভাবে তাদের স্টেটলেস অবস্থা থেকে মূলধারায় চলে আসল, তাদের স্টেটলেসনেসটাকে শেষ করল, এটা কিন্তু তার একটা এক্সাম্পল, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা এক্সাম্পল, যেটা আমি দেখেছি, লাস্টে আমি নেদ্যারল্যান্ডে গিয়েছি, হেগ সিটিতে, ফার্স্ট টাইম গ্লোবাল স্টেটলেসনেস নিয়ে একটা কনফারেন্স হয়েছে, ওই কনফারেন্সে গিয়ে দেখেছি, আমার একটা স্টেটমেন্ট ছিল, প্রেজেন্টেশন ছিল, ওই কনফারেন্স যারা স্টেটলেসনেস নিয়ে কথা বলেছে, আইরিন খান থেকে শুরু করে ইন্টারন্যাশনার স্কলারস, তারা প্রত্যেকেই তাদের স্পিচে প্রথমেই বলেছে, এই স্টেটলেসনেসের ওপরে সবচেয়ে গুড প্র্যাকটিস হল বাংলাদেশ, সেটা হল উর্দুভাষীদের, যে কিভাবে এই কম্যুনিটি স্টেটলেস হলো, এবং কিভাবে আবার স্ট্রাগল করে মূলধারায় ফিরে আসলো। তো আমাদের এই ২০০৮ জাজমেন্টটা কিন্তু খুব ইউনিভার্সাল একটা জাজমেন্ট। খুব ক্লিয়ার একটা জাজমেন্ট। ওইটা হওয়ার পর তো আমরা ফার্স্ট টাইম ভোট দিলাম ২০০৮ সালে। ভোটার আইডি কার্ড হয়েছে, তারপর আমরা গ্রাজুয়্যালি দেখলাম যে আমরা কেবল ভোটার হয়েছি, নাগরিক তো আমরা ছিলামই, শুধু ভোটার হয়েছি, আমাদের লাইফে আর কোন চেঞ্জেস আসছে না, আমরা বার্থ সার্টফিকেট পাচ্ছি না। তখন কিন্তু বলে দিয়েছে আইডি কার্ড পাওয়ার সাথে সাথে বার্থ সার্টিফিকেট ম্যান্ডাটরি। এখন কোন বাচ্চা যদি স্কুলে ভর্তি হতে চায়

তাকে বার্থ সার্টিফিকেট শো করতে হবে। এখন আমাদের মধ্যে এডুকেশনটা সামহাউ বাড়ছে, আমাদের কিছু লোকাল উর্দু স্পিকিং কম্যুনিটি, ডায়াস্পরা কম্যুনিটি, যারা ইউএসএতে থাকেন, তারা সাপোর্ট দিচ্ছেন, তোমরা পড়ে যাও। এডুকেশন নাও, এডুকেশন নিয়ে এগিয়ে যাও। তো আমাদের বাচ্চা পড়তে চায়, কিন্ত যখন স্কুলে যাচ্ছে, বার্থ সার্টিফিকেট নাই, বার্থ সার্টিফিকেট ছাড়া ভর্তি নিবে না। আমার গেলাম না, বার্থ সার্টিফিকেট দিবে না, কেন দিবে না? ক্যাম্পের অ্যাড্রেসে বার্থ সার্টিফিকেট হবে না, জন্মসনদ দিবে না। তখন ২০১২ সালে, ইউনেস্কোর একটা প্রোগ্রামে, ইউথ লিডারশিপ সামিট একটা হচ্ছিল, গ্লোবাল ইয়েতে, তখন আমি, জুনিয়র ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে তারা আমাকে সিলেক্ট করল, আমি ইউএসএ তে গেলাম, যাওয়ার পরে ওখানে নামাতি নামে একটা এনজিও আছে, তাদের সাথে দেখা হলো, তারা লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট ইস্যু নিয়ে কাজ করে, তারা কম্যুনিটি বেসড প্যারা লিগ্যাল তৈরি করে ওই প্যারা লিগ্যালদের দিয়ে লিগ্যাল যেসব সিভিল ডকুমেন্টস আছে, ওইগুলো পেতে সাহায্য করে, আমি তাদেরকে বললাম, দেখো আমরা পাসপোর্ট পাই না, বার্থ সার্টিফিকেট পাই না, আমরা ট্রেড লাইসেন্স পাই না, তো আমি কিছু করতে চাই। তখন তারা একটা ফান্ডিং রেইজ করলো আমাদের জন্য, আমরা ২০১৩ সালে বাংলাদেশে প্যারালিগ্যাল প্রোগ্রাম শুরু করলাম, বিভিন্ন ক্যাম্পে আমাদের প্রায় ষোলজন প্যারা লিগ্যাল আছেন, তারা ট্রেইনড, আমরা তাদেরকে লিগ্যাল ট্রেনিং দিয়েছি, এরা কি করে?, এরা ক্যাম্পের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে লোকজনকে মোটিভেট করে যে, বার্থ সার্টিফিকেট কি, কিভাবে নিতে হবে, এর উপকারগুলো কি, পাসপোর্ট কিভাবে পাবে। এবং এভাবে করে আমরা তাদেরকে মেসেজগুলা শুধু দিচ্ছি না, আমরা তাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছি। ওদেরকে আমাদের সেন্টারে নিয়ে আসি, আসার পরে ওদেরকে হাতে কলমে শিখাই, যে কিভাবে তোমরা বার্থ সার্টিফিকেটের ফরম ফিলাম করবা, আমরা এইটাকে সাসটেইনেবল করার জন্য আমরা কি করলাম, আমরা ক্লায়েন্টদেরকে, ক্যাম্পের লোকদেরকে, মহিলাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাই সিটি কর্পোরেশনে, আমাদের প্যারা লিগ্যালরা নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে দেখায় দেয়, যে দেখ তুমি এই অ্যাপ্লিকেশনটা এখানে জমা দিবা, আবার এখান থেকে রিসিভ করবা, এভাবে করে ফার্স্ট ইয়ারে অনেক, প্রায় পঁচিশশো এর মতো বার্থ সার্টিফিকেট করে

ফেললাম। যেহেতু বার্থ সার্টিফিকেট না হলে বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারবে না, আমাদের সেন্টারে লোকজন হুমড়ি খেয়ে এসে বলছে, ভাই আমার বার্থ সার্টিফিকেট করে দাও, আমার বার্থ সার্টিফিকেট করে দাও, এর আগে কিন্তু করা হতো, ব্রোকারদের মাধ্যমে করা হতো, ব্রোকাররা পাঁচশ টাকা চার্জ করতো, ছয়শ টাকা চার্জ করতো, কিন্তু এখন আমরা ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি, লিগ্যাল সাপোর্ট দিচ্ছি, বার্থ সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছি আমরা। পাসপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা, পাসপোর্ট পাচ্ছি না। একটা বছর চলে গেল আমরা একটা পাসপোর্টও ওন করতে পারলাম না। ২০১৪ তে গিয়ে আমরা কম্যুনিটি ডায়ালগ করলাম, যারা অ্যাপ্লাই করেছেন পান নি, আর কিছু ইন্টেলেকচুয়ালদের নিয়ে আমরা করলাম, সেখানে ব্যারিস্টার হাসান আরিফ ছিলেন, সারা হোসেন ছিলেন, আমরা মফিদুল ভাইকে নিয়ে আসলাম, মফিদুল ভাই আসলেন, তো উনারা সবাই এক কথাই বললেন, যে তোমাদেরকে কি অযুহাতে দিচ্ছে না? আমরা বললাম, দেখেন আমরা টেকনিক্যালি আমাদের প্রজেক্ট থেকে সৈয়দপুর, খুলনা, ময়মনসিং, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, পাঁচটা জায়গা থেকে আমরা প্রায় বারোটার মতো পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশন করলাম, করার পরে আমাদেরকে সৈয়দপুরে দিয়ে দিল, খুলনাতে দিয়ে দিল, ময়মনসিংহে দিয়ে দিল, পাসপোর্ট, ক্যাম্পের অ্যাড্রেসে, কিন্তু মোহাম্মদপুরে এবং মিরপুরে দিল না। তারা বলছে, এসবি বলছে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা, যে বিহারিদেরকে এবং রোহিঙ্গাদেরকে পাসপোর্ট দেওয়া হবে না, তখন আমাদের প্যারা লিগ্যাল বলল, কেন হবে না? ওরা বলল, না আমাদের কাছে ইন্সট্রাকশন আছে, কোথায় থেকে আসছে ইন্সট্রাকশন? তা হোম মিনিস্ট্রি থেকে, তখন আমি আবার কথা বললাম এসবির সঙ্গে যে ভাই আমাদের পাসপোর্টগুলো পাচ্ছে না, কারণটা কি? ওরা বলল, দেখেন, আমাদের কাছে রিটেন স্টেটমেন্ট আছে, তো আমি বললাম আমাকে সেই রিটেন স্টেটমেন্টটা দেন, কোন আইনের বলে আপনারা বিহারি এবং রোহিঙ্গাদের একসাথে করছেন, রোহিঙ্গারা তো রিফিউজি, আর বিহারিরা তো বাংলাদেশি, আপনি দুই বিষয়কে একসাথে কিভাবে করছেন? বিহারিদের আইডি কার্ড আছে, আপনি পাসপোর্ট দিতে বাধ্য, আপনি রিপোর্ট করবেন, ওরা তাও বললেন, আমাদের কাছে হোম মিনিস্ট্রি থেকে ইস্যু হওয়া রিটেন স্টেটমেন্ট আছে। আমি সিম্পলি তাদের বললাম, আমাকে ওই কাগজটা দেন,

দিলো না, তো ওই মিটিংয়ে একটা ইয়ে চলে আসল যে, এসবি অফিসার যদি না দেয় তাহলে তথ্য অধিকার আইনে যাও,যে ভাই বিহারিদের পাসপোর্ট পেতে পলিসি কি আছে, কৌশল কি আছে জানান। তো আমি ২০১৪ সালে তথ্য অধিকার আইনে একটা অ্যাপ্লিকেশন করলাম হোম মিনিস্ট্রিতে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমি বললাম যে, তিনটে প্রশ্ন দিলাম, উর্দুভাষীদের পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন নীতিমালা আছে কি না? ময়মনসিংহ, খুলনা, সৈয়দপুরে পাসপোর্ট পাওয়া গেছে কিভাবে? এবং মোহাম্মদপুর, মিরপুরে কেন দেওয়া হচ্ছে না? অ্যাপ্লিকেশন দিলাম, দেওয়ার পর কোন রেসপন্স হয় নি। ওয়েট করার পর আমরা আপিল করলাম, আপিলেও কোন সাড়াশব্দ পাই নি। পরে আমরা তথ্য অধিকার কমিশনে একটা কমপ্লেইন করলাম। কমপ্লেইন করার পর, পনের দিন পর, একটা লেটার ইস্যু করা হলো, সমন জারি হল, আমার নামে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নামে। আপনাদের হিয়ারিং আছে, থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর, ২০১৪, আপনারা দুজন সশরীরে হাজির হবেন, আপনাদের তথ্য নিয়ে যে বিরোধ আছে তা আমরা মিটমাট করতে চাই। তো আমি ব্যারিস্টার সারা হোসেনের সাথে কথা বললাম, সারা আপা বললেন, ঠিক আছে খালিদ তুমি যাও, ভালো হয় যদি আমাদের ওখান থেকে ভালো একজন এক্সপার্ট নিয়ে যাও। জবাব তুমিই দিবে কিন্তু সে তোমায় হেল্প করবে। তো আমরা ওখান থেকে ব্যারিস্টার আকমলকে নিয়ে গেলাম, যাওয়ার পর দেখলাম যে, আমরা হাজির হয়েছি কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে লোকজন হাজির হয় নি, তারপর উনারা বললেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছু সময় চেয়েছে, আরও সপ্তাহ খানেক সময় চেয়েছে, তারা এই বিষয়ে আরও জানতে চায়। তো আমাদেরকে বলা হল, আপনারা চলে যান, আপনাদেরকে আবার ডাকা হবে। তো আমরা চলে আসলাম। চলে আসার পর একটা সমন পেলাম, পঁচিশ তারিখ জানুয়ারী মাসের, ২০১৫। এই তারিখে বেলা দশটায় আপনাদের হেয়ারিং আছে, আপনাদেরকে আসতে হবে। এবার আমি ওয়েট করতে থাকলাম, তারা নিশ্চয় আসবে। এবার আমি পঁচিশ তারিখ আসার আগে, বাইশ তারিখে আমার বাসার ঠিকানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ছয় পাতার প্রিন্টেড, আমার অ্যান্সার পেয়ে গেলাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম, যে ২০০৮ সালে যখন আমাদের আইডি কার্ড হয়েছিল, তখন জেনেভা ক্যাম্প থেকে তিনজন লোক নিজ উদ্যোগে

পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল। তখন কিন্তু পাসপোর্ট অথরিটি একটা লেটার ইস্যু করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে, যে এরা বাংলাদেশের নাগরিক, এদের কাছে আইডি কার্ড আছে এবং এরা পাসপোর্ট চাচ্ছে। আপনারা আমাদেরকে বলেন, আমরা তাদেরকে পাসপোর্ট দিবো কিনা, এই বলে তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটা লেটার ইস্যু করলো। ২০০৯ সালে তার অ্যান্সার দিয়েছে, ২০০৮ সালে অ্যাপ্লাই করেছিল, যে আটকে পড়া পাকিস্তানি যারা আছেন, যারা আনুগত্য স্বীকার করে আইডি কার্ড নিয়েছে, তারা পাসপোর্ট পেতে পারেন, এবং পাবেন, এই বলে অ্যান্সার দিয়েছে, এবং ওই কপিটা তিনি ডিসিকে দিয়েছে, পাসপোর্ট অথরিটিকে দিয়েছেন, এবং সমস্ত ডিসিকে দিয়েছেন। উনারা সকল ডকুমেন্টস আমাকে দিয়ে দিল, তার মানে আমি পেয়ে গেলাম, তার মানে আর কোন ঝামেলা নাই পাসপোর্ট পেতে, কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তো অ্যান্সার দিয়েছে ২০০৯ সালে, যে ভাই আমি তো বলেই দিয়েছে যাদের কাছে আইডি কার্ড আছে দো দে আর লিভিং ইনসাইড অর আউটসাইড অফ দ্য ক্যাম্প, দে আর অ্যাবল টু গেট পাসপোর্ট। বলে দিয়েছে, তো আমি আমার এক্সপার্টদের বললাম যে আমি তো ডকুমেন্ট পেয়ে গেছি, এইটা বড় একটা খুশির ব্যাপার, একটা ভ্যালিড ডকুমেন্টস আমাদের হাতে, তো সারা আপা বললেন, তারপরও তুমি পঁচিশ তারিখে হেয়ারিংয়ে যাবা, গিয়ে দেখ কি হয়, তো আমি গেলাম, গিয়ে দেখলাম, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি আসছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে, হেয়ারিং শুরু হলো, হওয়ার পর প্রথমে আমাকে বলা হল, কেন আমি, কি তথ্য জানতে চেয়েছিলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে, আমি বললাম আমি লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট ইস্যুতে কাজ করি, আমার কম্যুনিটির লোকজন পাসপোর্ট পাচ্ছে না, কেন দেওয়া হবে না এইটা জানতে চেয়ে তাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম, কিন্তু তারপর আমি পঁচিশ তারিখের আগে বাইশ তারিখে পাসপোর্টগুলো পেয়ে যাই। তারপর উনাকে ফ্লোর দেওয়া হলো, উনি কি দিয়েছেন তথ্য? উনি বললেন, আমরা তো বলেই দিয়েছি যাদের কাছে আইডি কার্ড আছে তারা পাবে পাসপোর্ট, তো উনারা বললেন, যে ইনফরমেশনটা আপনারা ২০০৯ সালে দিয়েছেন তা কি ওয়েবসাইটে দিয়েছেন, না, কোন পত্রিকায় দিয়েছেন? না। তো ইনফরমেশন কমিশন বলছে, আমরা যারা এখানে আমি আমরা নিজেরাই জানি না, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনারা

দিয়েছেন, শিক্ষিত সমাজ যারা আছে তারা জানে না,যারা ক্যাম্পে থাকে ওরা কি জানবে! আপনাদের উচিৎ ছিল ওয়েবসাইটে দেওয়া, মিডিয়াতে দেওয়া, ওয়েব সাইট-মিডিয়াতে থাকলে এসবি অফিসাররা তাদেরকে হয়রানি করত না। এরা যে হয়রানির শিকার হচ্ছে, দেশের নাগরিক, হত না। উনাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হলো, ঠিক আছে আপনি গিয়ে ডকুমেন্টসটা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেন, আমাকে বলা হল, যে পাসপোর্টগুলো রিজেক্ট হয়েছে সেগুলো আপনি রিসাবমিট করেন। তো আমরা এসে তিনটি পাসপোর্ট আবার রি অ্যাপ্লাই করলাম, রি অ্যাপ্লাই করার পর আবার এসবি অফিসার আসল, প্রথমে আসলো মার্কিন ক্যাম্পে, দুইটা পাসপোর্ট একই সাথে, হাজবেন্ড ওয়াইফ, এসবি অফিসার এসে বলল, আপনারা তো নাগরিক না, আপনাদের বিদ্যুৎ বিল কই, আপনাদের আইডি কার্ড আছে, কিন্তু আইডি কার্ড থাকলেই তো আপনারা নাগরিক হবেন না, অমুন না তমুক না। তখন আমার প্যারালিগ্যালরা বলল, যে ভাই আমাদের কাছে কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্ডার আছে, তো উনি থমকে গেলেন, কি অর্ডার ভাই দেখান, তো উনাকে দেখালাম, ছয় পাতা অর্ডার আছে, দেখেন। তো উনি বললেন, ঠিক আছে এইটার একটা কপি আমাকে দেন, আর আপনারা একটা কাজ করেন, আপনারা নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন কাউন্সিলরদের কাছ থেকে। আমরা দিলাম, দেওয়ার উনি ওই দুইটা পাসপোর্ট ইস্যু করে দিলেন, দুইটা পাসপোর্ট আমরা সেকেন্ড টাইমে পেয়ে গেলাম, কিন্তু জেনেভা ক্যাম্পে যেটা হল, মোহম্মদ জাবেদ, লোকটার নাম, উনারও রি অ্যাপ্লাই হলো, এসবি আসলো, আসার পরে উনি বললেন, না আমি পাসপোর্ট ইস্যু করতে পারব না, কেন পারব না? যে আপনার বিদ্যুৎ বিল নাই, গ্যাস বিল নাই, কোন দলিল নাই, আইডি কার্ড দিয়ে শুধু হবে না। আমরা বললাম আমাদের কাছে হোম মিনিস্ট্রির অর্ডার আছে, তিনি বললেন এই অর্ডার তো আপনাকে পাঠানো হয়েছে, আমি তো পাই নি, এই অর্ডারের আমার কাছে কোন মূল্য নাই। চলে গেলেন, যাওয়ার পর এইটা আমরা আবার থার্ডটাই অ্যাপ্লাই করলাম, থার্ড টাইম এসবি অফিসার আসলো, অফিসার বলল, আমি কিছু করতে পারব না, আমি আমার সিনিয়রকে জিগ্যেস করবো, সিনিয়র বললেন, না এই অর্ডার আমরা মানি না। আমরা পাইনি, ফোর্থ টাইম অ্যাপ্লাই করলাম, পেলাম না, এসবি বলছে আমরা পারব না, আপনি একটা কাজ করেন, উনি আমাকে বুদ্ধি দিচ্ছে, আপনি

বাইরের অ্যাড্রেসে পাসপোর্ট করে নেন, আপনার জেনেভা ক্যাম্পের অ্যাড্রেসে পাসপোর্ট করার, আমরা জানি আপনি বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু আমি ক্যাম্পের অ্যাড্রেসে দিতে পারছি না, ফোর্থ টাইম, রিজেক্ট করে দিলো। একটা লোক ২০১৩ তে অ্যাপ্লাই করেছে, অদ্যাবধি, আজ পর্যন্ত কিন্তু রিজেক্টেড। তার কোন সমাধান হয় নি। আমরা আবার ওইটাকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দিলাম, আজকে ছয় মাস প্রায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দিলে ওরা, এনট্রি করলেন, সই করলেন, কেস হিসেবে নিলেন, তারপর হোমমিনিস্ট্রিকে লেটার দিলেন, পাসপোর্ট অথরিটিকে লেটার দিলেন, এসবিকে লেটার দিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত এসবিও যায় নাই, পাসপোর্ট অথরিটি যায় নাই, কেউ যায় নাই। এখন আমরা প্লান করছি, ড. শাহদীন মালিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, উনার স্টেটমেন্ট হচ্ছে যে, এভাবে সমাধান হবে না। এটাকে আবার কোর্টে নিতে হবে, নিয়ে রায় নিতে হবে, না হলে কিন্তু আজ এই এসবি, কাল ওই এসবি এভাবে করে ঘুরাবে। তো এই যে এত বড় একটা জনগোষ্ঠী, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে মানবেতর জীবন যাপন করে আসছে, তারা যে এই দেশটাকে মেনে নিয়ে সে সুযোগও তাদের নাই।

ফারহান: আপনার ছোটবেলার কথা বললেন, যে আপনি স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় স্ট্রাগলের শিকার হয়েছেন। সে সম্পর্কে যদি দু একটা বলেন।

খালেদ: সেটা আসলেই খুব পেইনফুল ছিল আমাদের জন্য যে, আমরা এত নেগ্লেক্টেড ছিলাম স্কুলে, ভয়ে কারো সঙ্গে বন্ধুত্বও করতাম না, লুকিয়ে রাখতে পারতাম আমি বিহারি না আমি বাঙালি, তখন কিন্তু, এক বছর পর বাংলা বলতে পারছি, বুঝতে পারছি, কিন্তু ওই সাহস হতো না, যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা। এই কম্যুনিটির একটা গুড থিং হচ্ছে এরা মুসলমান, যদি হাইড করি যে আমি বিহারি না, আমি বাঙালি তাহলে কিন্তু বুঝার কেউ নাই। যদি বলি, না আমি উর্দুভাষী, আমি বাঙালি না, আমি অন্য জাতিসত্ত্বার লোক, সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আবার মাইনরিটি। তো আমরা আমাদের স্ট্রাগলে যেটা দেখেছি, ফ্রাস্টেশন কিন্ত এখানে, এখন যে ইউথরা আছে, তারা কিন্তু ফ্রাস্টেটেড, তার কি করবে? তারা

কি মার্জ করে যাবে, বাঙালি হয়ে যাবে? না তাদের যে ইন্ডিয়ান ট্রাডিশন আছে, তাদের যে খাবার, যে হ্যাবিট আছে, যে কালচার আছে সেগুলো ধরে রাখবে? আমাদের কিন্তু রিলিজিওন এক হলেও অনেক ডিফারেন্স আছে, যেমন দেখেন যে মহরম একটা ফেস্টিভাল, যেটা বাঙ্গালি কিন্তু অবজার্ভ করে না কিন্তু আমরা করি। মহরম কিন্তু কোন রিলিজিয়ন না, এইটা রিচুয়াল, এইটা ট্রাডিশন, সেই ট্রাডিশন, সেই বেদনাকে আমরা লালন করে আসছি, আমি যদি বাঙালি হয়ে যাই তাহলে এসব ভুলে যেতে হবে, আমি পালন করবো না। আমি যদি বাঙালি হয়ে যাই, তাহলে আমাকে ভুলে যেতে হবে, ভুলে যেতে হবে আমার খাবারের যে বিউটিজ আছে, সেগুলো ভুলে যেতে হবে। আমাদের যে বিয়ে শাদি হয় তার কিছু স্পেশাল রিচুয়াল আছে সেগুলো ভুলে যেতে হবে। কোন ছেলে মেয়ে যখন জন্ম নেয় তখন আমাদের রিচুয়ালগুলো কিন্তু একদম আলাদা, বাঙ্গালির চেয়ে আলাদা। আমাদের মধ্যে কিছু ট্রাডিশন যেটা হিন্দু থেকে আমরা নিয়ে আসছি, ওই ট্রাডিশন এখনও চলে আসছে আমাদের মধ্যে। আমরা ফ্রাস্ট্রেটেড, ইভেন আমার পরের জেনারেশন যারা আছে, তারা আরও ফ্রাস্ট্রেটেড, তারা কি করবে? তারা কি বাঙ্গালি হয়ে যাবে,তাদের ট্রাডিশন ভুলে যাবে, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজও ভুলে যাবে? নাকি তারা ওই মাইনরিটিই থেকে যাবে? তো আমরা চিন্তা করছি, না এই কম্যুনিটি উর্দুভাষী হিসেবেই থাক, তাদের যে বিউটিজগুলো আছে সেগুলো নিয়েই থাক। আমরা বিলিভ করি ডাইভারসিটিতে, একটা দেশে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষ থাকবে, আমরাও থাকি ওভাবে, আমাদের যে হ্যাবিটগুলা আছে সেগুলো প্রাকটিস করি, আমরা মাছের চেয়ে মাংস বেশি পছন্দ করি, সেটাতেই আমরা অভ্যস্ত, সেটাই আমরা করি।

ফারহান: আপনার কথায় উঠে আসলো যে রিচুয়ালের কথা, অনেকগুলো রিচুয়াল যেগুলো আলাদা, যেগুলো ধরে রাখতে চান, মার্জ হলে যেগুলোতে সমস্যা হতে পারে, তো সেই রিচুয়াল সম্পর্কে যদি বলতেন?

খালেদ: সেগুলোর মধ্যে প্রধাণত যেটা হয়েছে, সেটা বিয়ে-শাদির ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায়, সিম্পলি, বাঙালি বিয়ে এবং উর্দুভাষীদের বিয়ে কিন্তু একটু ডিফ্রেন্ট আছে, রিলিজিয়ন যে এক্সপার্টগুলো আছে সেইটা কিন্তু সেম, কি করতে হবে? দুজন

সাক্ষী থাকতে হবে, একজন ওকালত দিবে, নিকাহ হবে, কবুল বলবে এগুলি সিম্পলি আছে, বৌভাত হয়। কিন্তু এর মধ্যে রিচুয়ালগুলো হলো, অনেকগুলো কাস্টম করতে হয়, যেমন আমাদের বিয়েতে আমরা কিন্তু সিঁদুর পরাই, এটা টোটালি একটা হিন্দু কাস্টম থেকে, কিন্তু আমরা মুসলমান আমরা বাঙালি পরাই, সিঁদুরের অলটারনেটিভ আমরা বেছে নিয়েছি, শুরু থেকেই, ইন্ডিয়া থেকেই আমরা, আমরা সান্দাল বলি, সান্দাল বলে একটা জিনিস আছে পাউডারের মতো, আমার সেটা পরাই, সেটা কি করি? হিন্দুরা তো হাতে পরায়, আমরা হাতে না পরিয়ে, আমাদের ওই বিয়েতে ছেলেকে একটা আংটি পরানো হয়, রূপার আংটির উপরে একটা গর্ত থাকে, তো ওই আংটির গর্তে পাউডার নিয়ে ইয়ে (কপালে) দিতে হয়, এটা একটা আর্ট, একটা কালচার। এটা না করলে মনে হয় যে, নাহ একটা পার্ট মনে হয় রয়ে গেল, বিয়ের। তো এগুলো হল একটা বিউটি। গায়ে হলুদেরও অনেকগুলো সিস্টেম আছে, যে গায়ে হলুদ হবে এবং বিয়ের আগের রাতে কিছু রান্না করতে হবে, যেমন মিষ্টি দিয়ে, যেটাকে আমরা গুলগুল্লা বলি, একটা সুইটস আমরা করি, এটা কিন্তু ইন্ডিয়ার হেরিটেজ, ওই রান্না কিন্তু হবে, ছেলে পক্ষও করবে, মেয়ে পক্ষও করবে, ওইটা করে ওইটাকে নিয়ে যেতে হবে একদম ভোরে, যখন ফজরের আজান হবে, আজানের সাথে সাথে বেরোতে হবে, তিনজন মহিলা বের হবে ওইটাকে নিয়ে, মসজিদে যাবে, মসজিদে ওখানে রেখে দিবে, ওই মিস্টি খাবারের সাথে ময়দা দিয়ে একটা দিয়া বানাবে, ওই দিয়াতে একটা কটনের কাপড় রাখবে, তারমধ্যে ঘি দেবে, ঘি দিয়ে ওইটাকে আগুন দিয়ে পোড়াবে, আগুন দিয়ে রেখে দিবে, ওইটা সারাক্ষণ ওইভাবে থাকবে, তো এই যে রিচুয়ালগুলা আছে, এই রিচুয়ালগুলা তো আমরা অন্য কম্যুনিটিতে পাবো না। বাচ্চা হলেই, নবজাত যদি জন্ম নেয়, তার আগেই কিন্তু আমরা, এটা বলি গোদভারাই আমরা, বাচ্চা যখন মায়ের পেটে সাতমাস থাকে তখন ওই গর্ভবতীকে নতুন কাপড় দিয়ে, আত্মীয় স্বজন সবাই আসে, সবাই তার কোলে ফলগুলো দেয়, অনেকগুলো ফল দেয়, বিভিন্ন ফল, যে সিজনাল ফলগুলো থাকে, ওগুলো দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আবার অনেকগুলা অফান আছে যে ময়দা দিয়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে বানানো হয়, ছেলে মেয়ে বানিয়ে তাকে বলা হয় যে তুমি ধরো, সে যদি ছেলে তুলে নেয় তবে এক্সপেক্ট করা হয় যে ছেলে হবে, সে যদি মেয়ে তুলে নেয় ময়দার পুতুল

থেকে তাহলে ধরে নেওয়া হয় মেয়ে হবে, এই যে কাস্টগুলো এগুলো কিন্তু হারিয়ে যাবে। এখন যেটা হচ্ছে, অনেকেই যারা আমাদের মধ্যে আছেন, শিক্ষিত হচ্ছেন এবং বেরিয়ে যাচ্ছেন ক্যাম্প থেকে, বের হয়ে গিয়ে তারা কিন্তু কমপ্লিটলি হাইড করছেন যে, না আমি বিহারি না, মোটেও না, আমি কোন রিচুয়াল পালন করবো না, আমি সিম্পলি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকবো। আমি নিজেকে বাঙালি বানায়ে ফেলব, শেষ, দেশের বাড়ি কোথায়? আমি একটা বানায়ে বলে দেবো দেশের বাড়ি। তো এই হলো একটা, রিচুয়ালের একটা সিস্টেম।

ফারহান: আচ্ছা, আপনার ক্ষেত্রে যদি আমি প্রশ্ন করি আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? আপনার অ্যান্সার কি হবে?

খালেদ: এইটা আসলেই খুব কনফিউজিং একটা ব্যাপার, যে সব জায়গায়ই ধরা, মানে এই পর্যন্ত যেখানেই যাই, আমরা কমনলি যারা বাংলাদেশে আছি, প্রথমেই বলা হবে, ভাই দেশ কোথায়? কমন, আমরা সবাই কিন্তু জিগ্যেস করি, আমরা খুঁজি যে কে নোয়াখালী থেকে, কে বরিশাল থেকে, তো যখন আমাকে বলা হয় দেশের বাড়ি কোথায় - কোন দেশের বাড়ি তো নাই আমার, আমি তখন বলি ঢাকা। বাধ্য হয়ে আমি বলি ঢাকা। যেহেতু, উর্দুভাষীরা কিন্তু আর্বান বেসড, কিন্তু যে উর্দুভাষী সৈয়দপুরে আছে, সে যখন ঢাকাতে আসছে, সে বলছে দেশের বাড়ি সৈয়দপুর, ফ্রাঙ্কলি বলছে। যারা রংপুরে আছে তারা বলছে দেশের বাড়ি রংপুর। কিন্তু যারা ঢাকাতে আছে, তাদের কিন্তু বলার কিছু নেই, আমি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কিন্তু এই অ্যান্সার দিতে পারিনি। দেশের বাড়ি কোথায়? - ঢাকা, ঢাকা কোথায়? ওল্ড ঢাকা? না আমি তো ঢাকাইয়াও না, ঢাকা, ব্যাস ঢাকা। তারপর বলতাম ভাই আমি উর্দুভাষী, আমি বিহারি, আমার দেশের বাড়ি নাই, এভাবে বলতাম।

ফারহান: একটু পেছনে ফিরে যাই, আপনি বলছিলেন যে একাত্তরে স্ট্রাগলের কথা বলছিলেন আপনার বাবা, ১৯৪৭ এ তারা যখন আসে আপনার বাবার বয়স দশ

বছর, আপনার চাচার সাত বছর, ওই বয়সে এসে তাদের কতটুকু কষ্ট হয়েছে মানিয়ে নিতে সেটা যদি একটু বলেন?

খালেদ: সেইটা আরকি আমার বাবা যেটা বলল, যে কষ্টের তো কোন শেষ ছিলো না। মামার সংসারে উনি থাকবেন, তো মামা নতুন একটা দেশে আসছে, তার কিছু নাই এখানে, শূণ্য হাতে আসছে, তো উনারও তেমন কোন সহায় সম্পত্তি ছিল না, যার কারণে বাবার লাইফটা খুব কষ্টে গিয়েছে। উনি বললেন, শুরু থেকেই চাইল্ড লেবার ছিলো এবং চেষ্টা করেছে ছোট ভাইকে এডুকেশন দেওয়ার, ক্লাস এইট পর্যন্ত নিয়ে গেল, অনেক ডিফ্রেন্ট কাজ করেছেন, রেল লাইনের কাজ করেছেন, কুলির কাজ করেছেন, তারপর ঢাকা চলে আসছেন, ঢাকাতে ভ্যারাইটিজ কাজ করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কাজ করে গেলেন, টাউন হল যেটা আছে, ওখানে একটা হোটেলে ছিলেন, ওয়েটার হিসেবে ছিলেন, হোটেলে। আমার যখন জন্ম, তখন হোটেলটা হয়েছে। এর আগে, আমার জন্মের আগে, উনি চকবাজারে কাজ করতেন, কি কাজ করতেন? কুলির কাজ করতেন, টুকরিতে করে মাল নিয়ে যাবেন নিয়ে আসবেন, তখন আমরা ক্যাম্পে আছি সবাই। তো ওয়েট করতে হতো আমাদের, যে উনি সন্ধ্যাবেলা আসবেন, কিছু বাজার নিয়ে আসবেন, সেটা রান্না হবে, সেটা খাওয়া হবে। তারপর একটা পর্যায়ে ওই চাকরিগুলো চলে যায়, তারপর সুফিয়া বোর্ডিং যেটা এখনও আছে ওল্ড ঢাকাতে, সুফিয়া বোর্ডিংয়ে উনি অনেকদিন ছিলেন, সুফিয়া বোর্ডিংয়ে কাজ করার পর ওই চাকরিও চলে যায় সামহাউ। নাইনটি এইটি ওয়ানে যখন আমার জন্ম হয় তখন উনি ওই হোটেলে কাজ নিলেন, যেহেতু লোকাল এলাকা আর ওই টাউনহল এলাকাতে অনেক উর্দুভাষী আছেন, তখন উনার ভালো একটা সুযোগ হলো, যেহেতু ওয়েটারের কাজ করছেন, টিপস নিচ্ছেন, স্যালারি আছে, তখন একটা ভালো অবস্থা হলো, তখন আমার ভাইরাও বড়, ওরাও কাজ করছে, সাপোর্ট একটা হচ্ছে। কিন্তু উনি স্বপ্ন দেখতেন যে না, কেউ তো পারে নাই পড়তে, অভাবে ইয়েতে, তো আমার একটা ঝোঁক ছিল যে আমি পড়ব, উনারও স্বপ্ন ছিল আমি অ্যাটলিস্ট একজনকে পড়াবো, তার স্বপ্ন ছিলো, যখন কোন কাস্টমার তার হোটেলে আসছে, তার সাথে সম্পর্ক হয়েছে, তখন বলতেন যে আমার ছেলে তো পড়ছে এখন ক্লাস এইটে আছে, নাইনে আছে,

তাকে আমি পড়াতে চাই। উনারা সাহস দিতেন, হ্যাঁ আপনি অবশ্যই পড়াবেন, কেন পড়াবেন না। তো এই করতে করতে বাবার, ইতিমধ্যে আমাদের মজার যে গল্পটা হলো, সেটা এইটিজ থেকে শুরু করে নাইনটি ফাইভ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে লোকজন সেল্ফ রিপ্যারশিয়েট করা শুরু করলো, তারা সামহাউ পাসপোর্ট করলো, পাসপোর্ট করে ক্যাম্পের ঘরগুলো বিক্রি করল, তারপর পাকিস্তান চলে গেল। এইটা শুরু হয়ে গেলে একদম, খুব খুব জোরে শোরে। তো আমার পরিবারও চিন্তা করল, মনে হয় আমরা বাংলাদেশে থাকব না, আমরা পাকিস্তান চলে যাবো। তখন কি হলো ঠিক আশির মাঝামাঝি, আমার বড়ভাই, পরিবার থেকে বলা হল, আগে তুমি যাও পাকিস্তানে। তারপর তুমি আস্তে আস্তে করে আমাদেরকে নিয়ে যাবা। তো কিভাবে যাবে, তখন তো আমাদের টাকা পয়সাও নাই, তখন কিন্তু একটা ট্রেন্ড ছিলো আমাদের ক্যাম্পের ভিতরে, কিছু উর্দুভাষী ইয়াংরা নাইনটিন সেভেনটি ওয়ানের পর বাংলাদেশ থেকে ভারত, ভারত থেকে অমৃতসর, অমৃতসর থেকে বর্ডার ক্রস করে পাকিস্তান যেত। এরা তিন চারজনের একটা গ্রুপ, এরা একবার বর্ডার ক্রস করার পর আবার ফিরে আসল এখানে, তখন তারা একটা বিজনেস শুরু করলো। ব্রোকার তারা, তারা দালাল, তারা এসে ক্যাম্পের ইউথদের বলল, দেখো তোমরা যদি পাকিস্তান যেতে চাও বাই রোড আমরা তোমাদেরকে নিয়ে যাবো। পারহেড তোমাদেরকে এত টাকা দিতে হবে, এই দেখে প্রতিটা ট্রিপে, প্রত্যেকটা ট্রিপ হতো দু'মাসের, প্রত্যেকটা ট্রিপে ওরা এখান থেকে বিশ জন, ত্রিশ জন, চল্লিশ জন করে এখান থেকে ইন্ডিয়া, কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে অমৃতসর, অমৃতসর থেকে লাহোর, লাহোর দিয়ে করাচি নিয়ে যেত, তো একবার সাহস করে আমার পরিবার বলল, আমার বড়ভাইকে তারা এভাবে পাঠাবে। আমার বড়ভাই তখন একদম ইয়াং, উনি যে বেবিটেক্সি এখন যে সিএনজি তার টেকনিশিয়ান ছিলেন, উনি ভালোই কাজ করছিলেন ওইসময়, নিজের গ্যারেজ ছিলো, সবকিছুই ছিলো, উনি একটা গাড়ি কিনেছিলেন, সিএনজি গাড়ি, ওই গাড়িটা ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলল, অ্যাক্সিডেন্ট করার ফলে ওই গাড়িটা থানায় চলে যায়, একটা লোক মারা গিয়েছিল, তো উনি ভয় পেয়ে গেল যে, মালিক তো আমি, হয়ত আমাকে ধরবে, যার কারণে উনি বললেন, না আমি আর এখানে থাকবো না। ওই সময়ে ওই দালাল চক্র

ছিলো, তো উনি উনাদের হাত ধরে চলে গেল, দুই মাস পর উনার খবর পেলাম আমরা, একটা চিঠি পাঠাল, উর্দু একটা চিঠি, তো চিঠিতে বলল, যদি কারও মায়ের সন্তান বোঝা হয়ে যায় তখনই কোন মা-বাবা তার সন্তানকে এই রাস্তায় পাকিস্তান পাঠাবে। এত্ত পেইনফুল, পুরা হিস্ট্রি লিখল যে কি কষ্ট করে আমরা ওখানে গিয়েছি। বর্ডার ক্রস করে গিয়েছি, যাক যাওয়ার পরে উনি খুব দ্রুত কাজ করা শুরু করল। কাজ করে কিছু টাকা পাঠাল ওখান থেকে, এখন প্ল্যান হলো যে আমার বড় আপা চলে যাবে, উনার বিয়ে হয়েছে, উনি তার হাসবেন্ডকে নিয়ে একটা মেয়েকে নিয়ে পাসপোর্ট করে চলে গেল। তারপর, উনি যাওয়ার পর উনি আমার মেজো আপাকে পাকিস্তান নিয়ে গেল পাসপোর্ট করে। তারপর আমার বাবা, এখন তার স্বপ্ন, যে আমি তো মারা যাবো আমার বয়স হয়েছে, আর আমার তিন মেয়ে দুই ছেলে ওখানে চলে গিয়েছে পাকিস্তানে, আমি ওখানে যাবো। আগে আমাকে পাঠাও, আমি যাই, তারপর তোমরা আসো। উনার এত দিনের স্বপ্ন ছিলো, উনি তো আর চেঞ্জগুলা বুঝে নাই, যে উনি বাংলাদেশের নাগরিক, বাংলাদেশে তাকে থেকে যেতে হবে, উনি এটা বিলিভও করেন নাই। উনি যে কষ্ট পেয়েছিলেন, এই দেশ তাকে যে কষ্ট দিয়েছিলো, তিনি সামহাউ মেনে নিতে পারেন নাই। উনি সবসময় বলতেন কষ্ট করে হলেও তোমরা এদেশ থেকে চলে যাও, উনি বিলিভ করতেন যে আজ হোক কাল হোক এই বাঙ্গালি আবার রিভেঞ্জ নিবে। যেভাবে আমাদের সাথে করেছে তোমাদেরকেও ছাড়বে না, উনার পার্সপেক্টিভ ছিলো এইটা, চিন্তা ছিলো এইটা, তো উনি মনেপ্রোণে চেয়েছিলেন যে এই দেশ থেকে চলে যাবেন। তো আমরা আবার টাকা পয়সা রেডি করে উনাকে পাঠায় দিলাম। উনি গেল ২০০৩ সালে, আমি কিন্তু তখন একটা অ্যান্টি পাকিস্তান অ্যাটিটিউডে চলে আসছি, আমি আমার কম্যুনিটি নিয়ে কথা বলছি, তারা বাংলাদেশে থাকবে, কিন্তু আমার বাবা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন ওখানে যে না তোমরাও এখানে চলে আসো। ততক্ষণে কিন্তু আমার আর আমার মেজো ভাইয়ের মাইন্ড একদম চেঞ্জড যে আমরা জীবনেও পাকিস্তান যাবো না, যাবো ঘুরতে যাবো কিন্তু সেটেল হবো না। তো আমার বাবা ওখানে চলে যায়, খুব আশা করে গিয়েছিল। আসলে ওই দেশ, যে দেশের জন্য তার মা তার সামনে আত্মহত্যা করল, পাকিস্তান হলো আবার ভেঙ্গে গেল, আর সেই পাকিস্তান, সেই দেশে যাবে, তার যে মেইন

টার্গেটটা ছিল ওই পাকিস্তানে যাওয়াটা, ওখানেই গিয়ে তার মনে হয় শান্তি পাবে, সেটা উল্টা হল, কমপ্লিটলি, উনার যাওয়ার পরে প্রায় ছয় থেকে সাত মাস পরেই উনি অসুস্থ হয়ে গেলেন, এবং দুই মাস যেতেই তিনি চিল্লা ফাল্লা শুরু করলেন যে তাকে বাংলাদেশে পাঠাও। উনি পাকিস্তানে থাকবে না, এই দেশের যে প্রচন্ড গরম, এই দেশের যে খাবার তার স্যুট করছে না। তিনি বললেন, না আমি বাংলাদেশে যাবো, আমাকে পাঠাও আমি আর ওদেশে থাকব না। কিন্তু আমাদের প্ল্যান ছিলো, এত টাকা খরচ করে তাকে পাঠানো হয়েছে, আমরা সবাই চলে যাবো, কিন্তু উনি ফিরে আসবেন, সাতমাসের মাথায়, সাত মাস হয়েছে কেবল, উনি ব্রেন স্ট্রোক করে মারা যায়। উনি আর এদেশে ফিরতে পারে না। তো এইটা ছিল আমাদের পরিবারের জন্য বড় একটা ধাক্কা যে উনি যে আশা নিয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার ব্যাক করতে চেয়েছিল বাংলাদেশে, যে না আমার আসলেই আসাটা ভুল হয়েছে, আমি এই দেশেই ভালো ছিলাম, কিন্তু আমরা আনবো আনবো এই আনাটাই আর হয় নাই। এখন আমি রিয়ালাইজ করি, আজকে যে পর্যায়ে আমি আছি, তখন এরকম থাকলে হয়ত আমি তাকে গিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু আমি অসহায় ছিলাম, স্টুডেন্ট ছিলাম, কিছু করতে পারি নাই। এটা আমার জীবনের বড় একটা দুঃখ যে আমার বাবা এখানে আসার জন্য মারা গেল।

ফারহান: আপনার কথায় উঠে আসছে যে একটা বর্ডার কিভাবে এফেক্ট করতে পারে একটা মানুষের জীবনে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে বর্ডার অথবা আমরা উপমহাদেশের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মধ্যেও ধরতে পারি, এইযে বর্ডারটা সেইটাকে আপনি কিভাবে দেখেন, সাইকোলজিক্যালি বা ফিজিক্যালি?

খালেদ: আসলে এইটা খুব দুঃখজনক, আমার যেটা মনে হয়েছে যে, আর এটা কিন্তু প্রুভড, যে জিন্না যেটা বলেছিল, হিন্দু মুসলিম একসাথে থাকতে পারে না, সেটা কিন্তু আমার এক্সপেরিয়েন্স বলছে, সেটা কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, আজকে যদি পাকিস্তান ভাগ না হত, যদি উপমহাদেশ থাকত, তাহলে হয়তবা এত মানুষের প্রাণ যেত, এত মানুষ সাফার করত না, হয়ত আমরা সবাই একটা দেশের মধ্যে থেকে যেতাম। আমরা অনায়াসে কিন্তু ঢাকা থেকে দিল্লি যেতে

পারতাম, ঢাকা থেকে কলকাতা যেতে পারতাম, কলকাতা থেকে ঢাকা আসতে পারতাম, বিয়ন্ড দ্য বর্ডার জিনিসগুলো থাকতো, কিন্তু যে ধর্মের নাম নিয়ে, কি ধর্ম? জিন্নার টার্গেট কি ছিল? যে মুসলমানরা এখানে সেফ না, তাহলে কি মুসলমানরা আজ পাকিস্তানে সেফ? আজকে প্রশ্ন এটাই কিন্তু। পাকিস্তানে কি মুসলিমরা সেফ? যেখানে মসজিদে মারা যাচ্ছে, নামাজ পড়তে গিয়ে, তাহলে আমার কি লাভ হলো এই পাকিস্তান দিয়ে? আমার এই পাকিস্তান কি দিলো, আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মুসলমান কিন্তু ভারতে আছে, তারা আছে, হয়তবা আমরাও থেকে যেতে পারতাম, ভারত বা ইন্ডিয়া বা হিন্দুস্তান বলে একটা দেশ থাকলেও আমরা সবাই মিলে একটা দেশ, সুন্দরভাবে দেশ গড়ে তুলতে পারতাম। এতগুলো ডাইভার্স কম্যুনিটি থাকতো, আমরা সবাই একসাথে থাকতে পারতাম, ভারতে কি মুসলমান প্রেসিডেন্ট হয় নাই? হয়েছে। হয়তবা প্রাইমমিনিস্টারও হতে পারতো, কিন্তু এই যে ধর্মকে ইউজ করে মানুষকে বোকা বানানো হয়েছে, এর ফসল কিন্তু আমরা পাচ্ছি, আর এটা বেশি চলে আসছে কিন্তু পাকিস্তান থেকেই। আমি এটা বলব যে, এটা কমপ্লিটলি একটা ভুল ধারনা ছিল, এই আইডিয়াটাই ছিল ফ্লপ একটা আইডিয়া। এতগুলো জনগোষ্ঠীকে শেষ করা, এতগুলো প্রতিভাকে, আজকে আমরা যারা ভাগ হয়ে গিয়েছি, আমাদের প্রতিভাগুলো নষ্ট হয়েছে, হয়তবা আমি ভারতে থেকে গেলে আরও ভালো কিছু করতে পারতাম, আমার বাবা শিক্ষিত হতে পারত, আমার বাবা কিন্তু, তার যে সহায় সম্পত্তিগুলো ছিলো সেগুলোকে ইউজ করে কিন্তু অনেককিছু চেঞ্জ করতে পারত। সে তা হারায় ফেলল, অনেক যারা শিক্ষাবিদ, যারা কবি, যারা পোয়েট তারা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তারা কিন্তু আরও ভালো কিছু করতে পারত।

ফারহান: দেশভাগটা জাস্ট একটা হিস্ট্রিক্যাল ফ্যাক্ট হলেও আপনাদের কাছে সেটা হয়ত একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে, কিভাবে দেখেন দেশভাগকে?

খালেদ: অবশ্যই, সেটা আমি বিশ্বাস করি, যে আমার পরিবার এবং আমার মতো যতোগুলো পরিবার আছে, আমরা কিন্তু সাতচল্লিশের শিকার, আমরা একাত্তরের শিকার, আমরা এখনও শিকার, যে ওতপ্রোতভাবে দেশভাগে আমরাই কিন্তু

অ্যাফেক্টেড বেশি, যেটা আমি বিলিভ করি, এই কম্যুনিটি যারা উর্দুভাষী মুসলিম, যারা ইন্ডিয়া থেকে মাইগ্রেট করে বিশেষত এই অঞ্চলে, আমি বিশ্বাস করি যারা এই অঞ্চলে আসছে তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি শিকার, আপনি দেখেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা বাঙালিরা আসে তারা কিন্তু, আমাদের মতো সাফার করতে হয়নি তাদের। আসামাত্র সে বাংলাদেশ পেয়েছে, সে তার ল্যাঙ্গুয়েজ পেয়েছে, সে তার জাতি পেয়েছে। ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব থেকে যে পাঞ্জাবি বা যে শিখ পাকিস্তানে গিয়েছে, বা পাকিস্তান থেকে যারা ইন্ডিয়া এসেছে তারা কিন্তু একটা প্রদেশ পেয়েছে, পাঞ্জাব পেয়েছে, হয়ত বা এই পাঞ্জাব সেই পাঞ্জাব এই বাঙ্গাল সেই বাঙ্গাল কিন্তু ইন্ডিয়ার মুসলমানরা যারা এখানে চলে আসলো, এখানে এসে কমপ্লিটলি ধরা খেয়েছে। এদের যে স্ট্রাগলটা, এদের যে স্যাক্রিফাইসটা, আমার মনে হয় না কোনদিনই শেষ হবে। এদের স্যাক্রিফাইসটা আমি মনে করি সাতচল্লিশে বা সেভেন্টি ওয়ানে সবচেয়ে বেশি সাফারার কিন্তু আমরাই।

ফারহান: ওপারের পোশাক, অর্থাৎ ভারতের যে পোশাক আশাক, খাদ্যাভাস, অথবা যার যা আছে সেটা আজকের এই আপনাকে গড়ে তুলতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে বলে আপনি মনে করেন?

খালেদ: বিশেষত এখনও আমরা যারা ক্যাম্পে আছি, আমরা কিন্তু ওই পোশাকে, ওই কালচারে এখনও অ্যাটাচড আছি, আমার বেশ মনে আছে যে, যখন আমরা ছিলাম, আমার বাবা যখন এখানে ছিলেন, উনি কুর্তা পরতেন, ওই কুর্তাটা দুই সাইডে দুইটা পকেট, এইটা কিন্তু পাঞ্জাবি না, এখান থেকে একটা প্লেট থাকতো এইভাবে করে, এখান থেকে একটা রাউন্ড থাকতো, আর এইরকম থাকতো। এই কুর্তা কিন্তু ক্যাম্পের বাইরে কেউ সেলাই করতে পারত না। শুধুমাত্র ক্যাম্পের দর্জিরাই পারত। এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান একটা ড্রেস, এখনও ইন্ডিয়াতে পরে, সেখান কলার থাকবে, দুইটা পকেট থাকবে, এই ড্রেসটাই কিন্তু উর্দুভাষী বয়স্করা পরে, আরেকটা ড্রেস, যেটা ইন্ডিয়ান ড্রেস, যেটা আমার বাবা পরত, আর দুইজন দর্জি ছিল তারা সেলাই করতেন, সেটাকে আমরা বলি নামাস্তিন, নামাস্তিন হলো হাত কাটা গেঞ্জির মতো, এখানে পকেট থাকবে, এখানে পকেট থাকবে, আর পিওর সুতি কাপড় দিয়ে করা হয় যেইটা। ওই নামাস্তিন কিন্তু

আজকে আবার নাই, যে দর্জি আছে তারা ওইটা সেলাই করতে পারে না। আমরা আলিগড় পাজামা পরতে কিন্তু অভ্যস্থ, আমরা কিন্তু ওই পাঠানদের মতো সালোয়ার কামিজ পরি না। ইন্ডিয়ান যে আলিগড় পাজামা আছে, কুর্তা আছে সেইটাই কিন্তু আমরা অভ্যস্ত পরতে। এখনও আমাদের মাঝে আছে সামহাউ। খাবার তো ডেফিনেটলি আছে। আপনি দেখবেন যে কোন রিপোর্ট হলে, মোস্তাকিম কাবাব, বিহারি কাবাব, এগুলা কিন্তু আছে।

ফারহান: আপনার মধ্যে অনেক স্মৃতি আছে, সেটা সুখ স্মৃতি দুখ স্মৃতি মিলিয়েই, তো এই স্মৃতি বা এই মূল্যবোধগুলো কি আপনি আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে দিবেন বা দিলেও কোন কোন স্মৃতি বা গল্পগুলো বলবেন?

খালেদ: আমার মনে হয় এই হেরিটেজগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য সেটা ডেসিমিনেট হওয়া দরকার। আমার পরবর্তী জন্ম যারা আছে, আমার ছেলে আছে, আমি এখন ক্যাম্পের বাইরে থাকি, আমার দুই ছেলে, আমার ছেলে শুরু থেকেই বাংলা বলছে, কিন্তু আমি আর আমার ওয়াইফ, আমরা উর্দুতে কথা বলি, তখন সে কিন্তু কনফিউজড হয়ে যায়, এখন নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমার বাসা থেকে বেরোচ্ছে। সে কিন্তু বাংলা বলছে তার সঙ্গে উর্দু মিক্সড করছে। সে বলছে, মা আমি আন্ডা খাব। আন্ডা কিন্তু উর্দু, বাংলা হল ডিম। মানে আমি প্রতিদিন হাসি তার ল্যাঙ্গুয়েজ শুনে শুনে। হাসতে হয় আমাকে শুনতে শুনতে। বৃষ্টি হচ্ছে, সেটা বলবে মা বারিষ হচ্ছে। বারিষ হল উর্দুতে। তো কেমন যেন একটা উল্টাপাল্টা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে সে বড় হচ্ছে। তখন তাকে বলা হচ্ছে, বাবা তুমি এখন বড় হচ্ছে, ভাল স্কুলে পড়ছো, ওয়াইডব্লিউসিএতে পড়ে সে, তুমি যদি ভাল বাংলা না বলতে পারো তাহলে কিন্তু লোকজন হাসবে। তুমি আন্ডা না বলো ডিম বলো, না হয় তুমি উর্দুর সঙ্গে প্রপার উর্দু বলো, তুমি বারিষ বলো, যদি বারিষই বলো তো মা বারিষ হ রিয়ে, তো উর্দু বল। ও বলে, ও আচ্ছা আচ্ছা এইটা উর্দু আর এইটা বাংলা। এখন কিন্তু সে মজা করে শিখতেছে, উর্দু আর বাংলা দুটাই শিখতেছে। তো আমার মনে হয় পরবর্তী প্রজন্মের জানা দরকার, যে স্মৃতিগুলো আমাদের, যেভাবে আমরা চলে আসছি, আইডেনটিটি কিন্তু খুব বড় একটা ব্যাপার, সে যদি হারায় ফেলে, সে যদি

বাঙ্গালি বানায় নেয়, তাহলে মনে হয় আমি খুশি হবো না। আমি বিলিভ করি সে নিজেকে স্টাব্লিশড করে বলবে আমি একজন উর্দুভাষী। বাঙালি ইজ নট এ সুপাররেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এমন তো নয়, যে উর্দুভাষী একটা সুপার রেস, না, কিন্তু একটা বিউটি আছে, জাতিগোষ্টীর একটা বিউটি আছে। না তুমি উর্দুভাষী ঠিক আছে তুমি উর্দু পড়বা, তুমি ফ্লুয়েন্টলি উর্দু বলবা, তুমি বাংলা বলবা, তুমি ইংরেজি বলবা। তুমি হিন্দিও বলবা। তো আমি চাইব যে আমার প্রজন্ম এভাবে গড়ে উঠুক। একটা ডাইমেনশন থাকুক, ডাইভারসিটি থাকুক তার মধ্যে, যে না আমি আসলে পারি। এটা তার জন্য অ্যাডভান্টটেজেস, আমার জন্য না। আমি যদি এখন ইন্ডিয়াতে চলে যাই, তাহলে কিন্তু কেউ আমাকে ট্রেস আউট করতে পারবে না। আমি যদি বিহারে চলে যাই তাহলে কিন্তু সুন্দরভাবে ভোজপুরী পারব, আমি হিন্দী পারব, আমি ইংরজি পারব, আমি উর্দুও পারব। এটা কিন্তু আমার স্ট্রেংথ, তো এই স্ট্রেংথ কেন আমি আমার ছেলেকে দিবো না? সে গড়ে উঠবে তার আইডেনটিটি নিয়ে। অবশ্যই। আজকে উর্দুভাষীরা নাপিত, আজকে উর্দুভাষীরা কসাই, আজকে উর্দুভাষীরা রিকশা পুলার, তার মানে না এই কমিউনিটির লোকজন আগে থেকেই কসাই। না, উর্দুভাষীরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে লিড করেছে, বড় বড় প্রফেসর ছিলেন, বড় বড় ডাক্তার ছিলেন, গোলাম মেহেদি বড় একজন ডাক্তার ছিল, ডাক্তার এজাজ আহমেদ কিন্তু বাংলাদেশের অর্থপেডিক সার্জন খুব বড় মাপের ছিলেন উনি। তো এই কম্যুনিটির দুঃখ করা কিছু নাই, এখন আমরা আবার পড়ছি, আমি একজন ল ইয়ার হয়েছি, প্রথম ল ইয়ার আমি জেনেভা ক্যাম্প থেকে, আরও কিন্তু দশজন ছেলে বের হয়ে আসতেছে, তো চেঞ্জ হবে, র‍্যাপেডলি চেঞ্জ হচ্ছে, এখন আবার ডাক্তার হবে, আবার ল ইয়ার হবে, আবার সাংবাদিক হবে, আবার পোয়েট হবে, তো আমি চাইব যেন এই হেরিটেজটা ধরে রাখে। আইডেনটিটি ধরে রাখুক, হ্যাঁ আমি উর্দুভাষী আমি বাংলাদেশি।

ফারহান: এনি ফাইনাল রিমার্কস ওর কমেন্টস?

খালেদ: এইটা পেইন আসলে। আইডেনটিটি একটা বড় ক্রাইসিস পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। তো আমি মনে করি আমরা যারা আছি, আমরা একে অপরকে বোঝার চেষ্টা

করি, প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা কাউকে বুঝতে চাই না। জেনেভা ক্যাম্পে কেউ ঢুকতে চায় না, এখানে তো এরা থাকে, না, আসুন, কথা বলুন, বুঝুন, এইটা কিন্তু ইমপর্টেন্ট। আমি যদি কাউকে বুঝতে না পারি তাহলে ক্লেইম করে তো লাভ নেই, ক্লেইম করার আগে বুঝতে হবে আসলেই তার মধ্যে এই দোষ আছে কিনা। মানুষকে বুঝতে পারাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে গেলে তার সঙ্গে মিশতে হবে, মানুষের কিন্তু দোষ গুণ থাকতেই পারে, তাই বলে কোন জাতিকে কিন্তু কলঙ্কিত করা ঠিক হবে না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কিন্তু ভালো এবং মন্দ লোক আছে। যারা খারাপ আছে তারা খারাপ আছে, তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে ভালোর দিকে নিয়ে আসার, আর কিছু ভালো লোকও আছে। ওই ভালো লোককে বঞ্চিত করা যাবে না। ওই ভালো লোককে বুঝার সুযোগ দিতে হবে, ওকে তাকে বুঝতে দিতে হবে, দুজন দুজনকে যখন বুঝতে পারবে তখন ক্ল্যাশটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। একজন ভালোমানুষ কিন্তু ভালোমানুষকে বুঝতে পারবে। এই ভালো মনে করাটাই, ভালো বুঝাটাই কিন্তু সমাজে শান্তি নিয়ে আসতে পারবে। যদি আমরা নেগ্লেক্ট করি যে আমার দরকার নাই তার সঙ্গে কথা বলার তাহলে তার মধ্যে যে প্রতিভা আছে সে সুযোগ পাবে না সেগুলো প্রকাশ করার। মানুষের প্রতিভাগুলোকে কিন্তু প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। তখনই কিন্তু আমরা শান্তিতে থাকতে পারব।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved